বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি পাঠ্যপুস্তকটি ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত। বইটিতে দুটো অংশ রয়েছে। একটি ব্যাকরণ অন্যটি নির্মিতি। ব্যাকরণ অংশে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য ব্যাকরণিক বিষয়সমূহ সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় উদাহরণসহ প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা সহজে প্রতিটি বিষয় আত্মস্থ করতে সক্ষম হবে। অপরদিকে নির্মিতি অংশের বিষয়সমূহ শ্রেণিমান ও মানবণ্টন অনুযায়ী লিখিত হয়েছে। আশা করা যায়, বইটি শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকারে আসবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক. ব্যাকরণ

১. ভাষা ও বাংলা ভাষা

১.১ ভাষা

প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষের ভাষা আছে। শরীর ও স্নায়ুবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ভাষা ব্যবহারের জন্য মানুষের স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গ যেভাবে তৈরি হয়েছে, অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। ভাষার সাহায্যে আমরা কথা বলি। ভাষার মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করি আমাদের অভিজ্ঞতা, নানা ধরনের আবেগ, বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি, যেমন– হিংসা, বিদ্বেষ, ভালোলাগা ও ভালোবাসা, ঘৃণা, ক্ষোভ ইত্যাদি। ভাষার আরও কাজ রয়েছে। ভাষা আমাদের শিক্ষার মাধ্যম, ভাষার সাহায্যে আমরা অন্যের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করি। ভাষাকে দেশগঠনের হাতিয়ার হিসেবেও গ্রহণ করা হয়। দেশগঠন বলতে দেশের ও মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বোঝায়। এই অগ্রগতি বা কল্যাণসাধন কীভাবে করা যাবে, কীভাবে দেশের মানুষের মঙ্গল করা সম্ভব—সেসব কথা ভাষার মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হয়। ভাষা দুই প্রকার–(ক) মৌখিক ভাষা ও (খ) লিখিত ভাষা।

১.২ ভাষার উপাদান

ভাষার প্রধান উপাদানগুলো হলো– ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও বাগর্থ। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো।

ক) **ধ্বনি :** বাতাসে আঘাতের ফলে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সব ধ্বনিই ভাষার ধ্বনি নয়। ভাষায় তাকেই ধ্বনি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে যা **বাগ্‌যন্ত্রের** সাহায্যে তৈরি হয়। বাগ্‌যন্ত্রের ক্ষমতা অসীম। এর সাহায্যে আমরা পশু-পাখির নানারকম ডাক ডাকতে বা অনুকরণ করতে পারি। কিন্তু এসব ভাষার ধ্বনি নয়। ভাষার ধ্বনি শুধু বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত হলে চলবে না, তাকে অবশ্যই অর্থপূর্ণ হতে হবে। পশু-পাখির ডাক কিংবা এজাতীয় কোনো ডাককে আমরা বলি আওয়াজ। **ভাষার** একটি ধ্বনির স্থলে আরেকটি ধ্বনি বদলে দিলে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়। যেমন– 'কাল'। এখানে ক্ ধ্বনিটি বদলিয়ে খ্ বললেই সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে এমন শব্দ তৈরি হয়। যেমন—খাল, গাল, তাল, ঢাল, মাল, শাল ইত্যাদি।এভাবে আমরা খ্ গ্ ত্ ম্ শ্ ধ্বনি পাই। ধ্বনির উপলব্ধি ভাষাভাষীদের মনেই রয়েছে এবং সাক্ষর ও নিরক্ষর সব মানুষই তা জানে, বোঝে ও ব্যবহার করে।

খ) **শব্দ :** এক বা একাধিক ধ্বনি মিলে শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন– মানুষ। এখানে পাঁচটি ধ্বনি আছে : ম্+আ+ন্+উ+শ্(ষ)। লক্ষ করো, এ-উদাহরণে শেষ ধ্বনিটি বোঝাতে তালব্য-শ লিখে প্রথম বন্ধনীতে মূর্ধন্য-ষ লেখা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, মূর্ধন্য-ষ ধ্বনি নয়, বর্ণ।

গ) **বাক্য :** বাক্য বলতে কথা বা বাচনকে বোঝায়। ভাষার উপাদান হিসেবে ধরলে বাক্যের স্থান তৃতীয়। ধ্বনি দিয়ে যা শুরু হয়েছিল শব্দে এসে তা আরও সংহত হয়। বাক্যে এসে পরিপূর্ণ না হলেও সে অনেকটাই পূর্ণতা পায়। প্রতিটি বাক্যই কেউ উৎপাদন করে আর কেউ শোনে। বাক্যের সঙ্গে তাই দুজনের সম্পর্ক রয়েছে– **বক্তা** ও **শ্রোতা**। এই দুই পক্ষের মধ্যে কোনো ঘাটতি থাকলে চলে না। বক্তা যা বলে তাতে

শ্রোতার সব কৌতূহল মিটতে হয়। এজন্য বলা হয়: যা উক্তি হিসেবে সম্পূর্ণ এবং যাতে শ্রোতা পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় তা-ই হলো **বাক্য**। যেমন– আমরা গ্রামে বাস করি। মহৎ গুণই মানুষকে বড় করে।

চিত্র : ১.১ : বক্তা ও শ্রোতা

ঘ) **বাগর্থ** : অভিধানে শব্দের অর্থ থাকে। কিন্তু সেই শব্দ যখন বিশেষ পরিবেশে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ বদলে যায়। একই কথা বলা চলে বাক্য প্রসঙ্গে। আমরা শব্দের সাহায্যে যে-বাক্য তৈরি করি, তার অর্থ বাক্যে গিয়ে পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন– 'পোড়া' একটি শব্দ। এর অর্থ 'দগ্ধ হওয়া' (আগুনে তার খড়ের ঘর পুড়ে গেছে)। শব্দটি দিয়ে যখন বাক্য তৈরি করে বলা হয় : 'আমার মন পুড়ছে'– তখন এ-'পোড়া' দগ্ধ হওয়া নয়। ভাষার শব্দ ও বাক্যের এসব অর্থের আলোচনাই হলো বাগর্থ।

১. ৩ প্রকাশমাধ্যম ও ভাষা

ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম নয়। এজন্য আরও কিছু মাধ্যম রয়েছে। ভাষা আবিষ্কারের পূর্বে নানারকম অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে, কখনো আবার ছবি এঁকে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করেছে। এজন্য নানা ধরনের চিহ্ন এবং সংকেতও ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা মুখ বা চেহারার নানা ভঙ্গি করে হাসি, কান্না, বিস্ময়, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি বোঝাতে পারি। মাথা নেড়ে হ্যাঁ বা না বোঝাতে পারি। এজাতীয় ভাষাকে বলে **অঙ্গভঙ্গির ভাষা**। রাস্তায় দেখা যায়, ট্রাফিক পুলিশ হাতের ইশারায় গাড়ি থামায়, আবার চলার নির্দেশ দেয়। রাস্তার দুপাশে অনেক নির্দেশ থাকে– কোন দিকে গাড়ি চলবে, কোন দিকে গাড়ি চলবে না, রাস্তা সোজা না বাঁকা, পথচারী কীভাবে রাস্তা পার হবে ইত্যাদি। যারা কথা বলতে ও শুনতে পায় না তাদের আমরা বলি মূক ও বধির। তাদের ব্যবহারের জন্য এক ধরনের ভাষা আছে। হাতের আঙুল ব্যবহার করে, কখনো আঙুল মুখে ছুঁয়ে, কখনো আবার হাত মাথায় উঠিয়ে, কখনো বুকে হাত দিয়ে তারা তাদের ভাব প্রকাশ করে। ভাষার মধ্যে এই যোগাযোগও পড়ে। একে বলে **সংকেত ভাষা**। **ইশারা ভাষা** হিসেবেও তা পরিচিত।

চিত্র : ১.২ : সংকেত ভাষা

১.৪ মাতৃভাষা ও বাংলা ভাষা

মাতৃভাষা অর্থ মায়ের ভাষা। অন্যভাবে বলা যায়, আমরা মায়ের কাছ থেকে যে-ভাষা শিখি তা-ই হলো আমাদের **মাতৃভাষা**। শিশু সব সময়ই যে মায়ের কাছ থেকে ভাষা শেখে তা নয়। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটে। মায়ের মতো যে শিশুকে প্রতিপালন করে কিংবা জন্মের পর থেকে যার সেবায় ও যত্নে শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে তার ভাষাই শিশু প্রথম শেখে। বাঙালি মায়ের সন্তান জন্মের পর থেকে স্প্যানিশ বা জার্মানভাষী মায়ের পরিচর্যায় বড় হলে তার প্রথম বা মাতৃভাষা কখনো বাংলা হবে না, হবে স্প্যানিশ বা জার্মান। তাই বলা হয়, শিশু প্রথম যে-ভাষা শেখে তা-ই তার **প্রথম ভাষা** বা **মাতৃভাষা**। সাধারণত দেখা যায় যে, বাঙালি মায়ের শিশুর মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজ মায়ের শিশুর ইংরেজি, আরবি মায়ের শিশুর আরবি, জাপানি মায়ের শিশুর জাপানি।

১.৫ ভাষার রূপবৈচিত্র্য

ভাষার কোনো অখণ্ড বা একক রূপ নেই। একই ভাষা নানা রূপে ব্যবহৃত হয়। ভাষার এসব রূপবৈচিত্র্য নিচে আলোচনা করা হলো।

উপভাষা

একই ভাষা যারা ব্যবহার করে তাদেরকে বলে একই ভাষাভাষী বা **ভাষিক সম্প্রদায়**। আমরা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি তারা সকলে বাংলাভাষী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। সকলের বাংলা আবার এক নয়। ভৌগোলিক ব্যবধান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমাজগঠন, ধর্ম, পেশা ইত্যাদি কারণে এক এলাকার ভাষা থেকে অন্য এলাকার ভাষায় পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। ভৌগোলিক ব্যবধান বা অঞ্চল ভেদে ভাষার যে-বৈচিত্র্য তা-ই হলো **উপভাষা**। এ-ভাষাকে **আঞ্চলিক ভাষা**-ও বলা হ । আমাদের প্রতিটি জেলার ভাষাই বৈচিত্র্যপূর্ণ। আমাদের প্রত্যেক জেলার নিজস্ব উপভাষা রয়েছে। উপভাষায় কথা বলা মোটেও দোষের নয়। উপভাষা হলো মায়ের মতো। মাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, নিজ-নিজ উপভাষাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে হবে। নিচে বাংলাদেশের কয়েকটি উপভাষার পরিচয় দেওয়া হলো।

উপভাষিক এলাকা		উপভাষার নমুনা
খুলনা-যশোর	:	অ্যাকজন মানুশির দুটো ছাওয়াল ছিল্।
বগুড়া	:	অ্যাকজনের দুই ব্যাটা ছৈল আছিল্।
রংপুর	:	অ্যাকজন ম্যানশের দুইক্না ব্যাটা আছিলো।
ঢাকা	:	অ্যাকজন মানশের দুইডা পোলা আছিলো।
ময়মনসিংহ	:	অ্যাকজনের দুই পুৎ আছিল্।
সিলেট	:	অ্যাক মানুশর দুই পোয়া আছিল্।
চট্টগ্রাম	:	এগুয়া মানশের দুয়া পোয়া আছিল্।
নোয়াখালী	:	অ্যাকজনের দুই হুত আছিল্।

প্রমিত ভাষা

একই ভাষার উপভাষাগুলো অনেক সময় বোধগম্য হয় না। এজন্য একটি উপভাষাকে আদর্শ ধরে সবার বোধগম্য ভাষা হিসেবে তৈরি ভাষারূপই হলো প্রমিত ভাষা। এ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, প্রশাসনিক কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পাদিত হয়। দেশের সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এ-ভাষারূপ ব্যবহার করা হয়। উপভাষা ও প্রমিত ভাষার পার্থক্য সুস্পষ্ট :

- প্রমিত ভাষার লিখিত ব্যাকরণ থাকে; উপভাষার থাকে না।
- উপভাষা শিশুকাল থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে অর্জন করতে হয়; প্রমিত ভাষা চর্চা করে শিখতে হয়।
- প্রমিত ভাষা শেখার বিষয়; উপভাষা অর্জনের বিষয়।

কথ্যভাষা

শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন, কিংবা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে আমরা বক্তব্য উপস্থাপন করি তখন ভাষা ব্যবহারে সচেতনতা দেখা যায়। তাই বিশেষ পরিবেশ ও প্রয়োজনের বাইরে যখন ভাষা ব্যবহার করা হয় তাকে কথ্যভাষা বলে। অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে বন্ধু কিংবা সহকর্মী বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এ-ভাষারূপ ব্যবহার করা হয়।

সাধু ও চলিতভাষা

মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষারূপ লিখিত ভাষায় গ্রহণ করা হয় না। মুখের ভাষা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হলেও লিখিত ভাষা সে-তুলনায় আড়ষ্ট ও কৃত্রিম। বাংলা লিখিত ভাষা যখন উদ্ভাবিত হয়, তখন উদ্ভাবকরা সেভাবেই বাংলা গদ্যের ভাষাকে তৈরি করেছিলেন। এ-ভাষাই **সাধুভাষা** বা **সাধুরীতি** হিসেবে পরিচিত। উল্লেখ করা যায় যে, সাধুভাষার সৃষ্টিতে যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন, তাঁরা বাংলা ভাষী হলেও লোকজ মানুষের ভাষারীতিতে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। ফলে সেই ভাষার আদলে তাঁরা ভাষার এই রীতি তৈরি করেন। সব পণ্ডিতই যে এ-আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাঁদের সে-প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে গ্রহণীয় হয় নি। সাধুভাষার পরিচয় গ্রহণ করলে দেখা যায় যে, এ-ভাষায় বেশি পরিমাণে সংস্কৃত শব্দই শুধু নেই, সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয় গৃহীত হয়েছে। প্রথম দিকের সাধুভাষা ছিল আড়ষ্ট। এ-ভাষা প্রাঞ্জল হয়ে উঠতে অনেক দিন লেগেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম এ কাজ করেন। এজন্য তাঁকে বাংলা সাধুভাষার জনক বলা হয়। নিচে সাধুভাষার উদাহরণ দেওয়া হলো :

> নদীতে স্নান করিবার সময় রাজদত্ত অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঞ্চলকোণ হইতে সলিলে পতিত হইয়াছিল। পতিত হইবামাত্র এক অতিবৃহৎ রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে। সেই মৎস্য, কতিপয় দিবস পর, এক ধীবরের জালে পতিত হইল। ধীবর, খণ্ড খণ্ড বিক্রয় করিবার মানসে, ঐ মৎস্যকে বহু অংশে বিভক্ত করিতে করিতে তদীয় উদরমধ্যে অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইল। ঐ অঙ্গুরীয় লইয়া, পরম উল্লসিত মনে, সে এক মণিকারের আপণে বিক্রয় করিতে গেল। [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : শকুন্তলা]

সাধুভাষার তুলনায় **চলিতভাষা** বা **চলিতরীতি** নবীন। সব ধরনের কৃত্রিমতা থেকে লিখিত বাংলা ভাষাকে মুক্ত করাই চলিতভাষা সৃষ্টির প্রেরণা। এ-ভাষা জীবনঘনিষ্ঠ, আমাদের প্রতিদিনের মুখের ভাষার কাছাকাছি। কোনো কষ্টকল্পনা এতে স্থান পায় না। এ-ভাষারীতির শব্দসমূহ স্বভাবতই আমাদের পরিচিত। বাংলা প্রবাদ-প্রবচন খুব সহজে এ-ভাষায় ব্যবহার করা যায়। নিচে বাংলা চলিতরীতির উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

> সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য, অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষ মিলিত হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষ মিলিত হয় কেবল মেলারই জন্যে, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশে। শাকসবজির খেতের সঙ্গে মানুষের যোগ ফসল-ফলানোর যোগ। ফুলের বাগানের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ পৃথক জাতের। সবজি খেতের শেষ উদ্দেশ্য খেতের বাইরে, সে হচ্ছে ভোজ্যসংগ্রহ। ফুলের বাগানের যে-উদ্দেশ্য তাকে এক হিসাবে সাহিত্য বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, মন তার সঙ্গে মিলতে চায়– সেখানে গিয়ে বসি, সেখানে বেড়াই, সেখানকার সঙ্গে যোগে মন খুশি হয়। [রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্যের তাৎপর্য]

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

ঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও :

১। প্রাণিজগতে একমাত্র কাদের ভাষা আছে?

ক. পাখির খ. পশুর গ. মানুষের ঘ. সবার

২। ভাষা ব্যবহারের জন্য অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষ ব্যতিক্রম যে দিক থেকে তা হলো–

i. স্নায়ুতন্ত্র

ii. মস্তিষ্ক

iii. মানুষের অন্যান্য প্রত্যঙ্গ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৩। ভাষার মাধ্যমে আমরা যে ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করি তা হলো–

i. হিংসা-বিদ্বেষ

ii. ভালোলাগা-ভালোবাসা

iii. ঘৃণা, ক্ষোভ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৪। ভাষাকে দেশগঠনের কী হিসেবে গ্রহণ করা হয়?

ক. মাধ্যম খ. হাতিয়ার গ. অঙ্গ ঘ. বাহক

৫। ভাষা কত প্রকার?

ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪

৬। যেসব ভাষা লেখার ব্যবস্থা নেই সেগুলোকে কী বলে?

ক. মৌখিক ভাষা খ. লিখিত ভাষা গ. ইশারা ভাষা ঘ. সব কটি

৭। কোন ভাষার সীমাবদ্ধতা আছে?

ক. লিখিত ভাষার খ. ইশারা ভাষার গ. মৌখিক ভাষার ঘ. সব কটি

৮। ভাষার লিখনব্যবস্থা—

i. বর্ণভিত্তিক

ii. অক্ষরভিত্তিক

iii. ভাবাত্মক

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৯। যে ভাষার বর্ণ রয়েছে সেগুলো হলো—

i. ইংরেজি

ii. বাংলা

iii. তামিল

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

১০। অক্ষর কী?

ক. বর্ণ খ. ধ্বনি গ. বাক্য ঘ. কথার টুকরো অংশ

১১। উচ্চারণের একক কী?

ক. বর্ণ খ. ধ্বনি গ. অক্ষর ঘ. শব্দ

১২। অক্ষর অনুযায়ী যেসব ভাষা লেখার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাকে কোন ধরনের লিখনরীতি বলে?

ক. বর্ণভিত্তিক খ. অক্ষরভিত্তিক গ. ভাবাত্মক ঘ. ভাষাভিত্তিক

১৩। ভাষার প্রধান উপাদান কয়টি?

ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪

১৪। কোনটি ভাষার উপাদান নয়?

ক. বাগ্‌ধ্বনি খ. বাগর্থ গ. আওয়াজ ঘ. বাক্য

১৫। পশু-পাখির ডাককে কী বলে?

ক. ধ্বনি খ. ভাষা গ. আওয়াজ ঘ. সংকেত

১৬। এক বা একাধিক ধ্বনি মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে কী বলে?

ক. আওয়াজ খ. শব্দ গ. ধ্বনি ঘ. ভাষা

১৭। বাক্য বলতে বোঝায়—

i. কথা

ii. বাচন

iii. অর্থবোধক শব্দ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

১৮। ভাষার উপাদান হিসেবে ধরলে বাক্যের স্থান কততম?

ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

১৯। বাক্যের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে—

i. বক্তার

ii. শ্রোতার

iii. দর্শকের

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২০। ভাষার শব্দ ও বাক্যের অর্থের আলোচনাকে কী বলে?

ক. ধ্বনি খ. শব্দ গ. বাক্য ঘ. বাগর্থ

২১। অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে, ছবি এঁকে, নানা ধরনের চিহ্ন ও সংকেত ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করাকে কী ভাষা বলে?

ক. অঙ্গভঙ্গির ভাষা খ. ভাব-বিনিময়ের ভাষা গ. চোখের ভাষা ঘ. বর্ণনার ভাষা

২২। সংকেত ভাষা প্রকাশ করা হয়—

i. আঙুল মুখে ছুঁয়ে

ii. হাত মাথায় উঠিয়ে

iii. বুকে হাত দিয়ে

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২৩। সংকেত ভাষার অপর নাম কী?

ক. চোখের ভাষা খ. ভাব-বিনিময়ের ভাষা গ. ইশারা ভাষা ঘ. বর্ণনার ভাষা

২৪। মাতৃভাষা হলো—

i. মায়ের কাছ থেকে শেখা ভাষা

ii. মায়ের মতো যে শিশুকে প্রতিপালন করে তার কাছ থেকে শেখা ভাষা

iii. জন্মের পর থেকে যার সেবা ও যত্নে শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে তার কাছ থেকে শেখা ভাষা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২৫। শিশু প্রথম যে-ভাষা শেখে তাকে বলে—

i. প্রথম ভাষা

ii. মাতৃভাষা

iii. বিদেশি ভাষা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২৬। ভৌগোলিক ব্যবধানের কারণে সৃষ্ট ভাষার রূপবৈচিত্র্যকে বলা হয়—

i. উপভাষা

ii. প্রমিত ভাষা

iii. কথ্যভাষা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২৭। ভৌগোলিক ব্যবধান বা অঞ্চলভেদে ভাষার যে-বৈচিত্র্য তাকে কী ভাষা বলে?

ক. কথ্যভাষা খ. উপভাষা গ. প্রমিত ভাষা ঘ. ব্যক্তিভাষা

২৮। উপভাষার আরেক নাম কী?

ক. আঞ্চলিক ভাষা খ. কথ্যভাষা গ. ব্যক্তিভাষা ঘ. প্রমিত ভাষা

২৯। একটি উপভাষাকে আদর্শ ধরে সবার বোধগম্য ভাষা হিসেবে তৈরি ভাষারূপকে কী বলে?

ক. ব্যক্তিভাষা খ. কথ্যভাষা গ. উপভাষা ঘ. প্রমিত ভাষা

৩০। প্রমিত ভাষার অপর নাম কী?

ক. ব্যক্তিভাষা খ. সামাজিক ভাষা গ. উপভাষা ঘ. কথ্যভাষা

৩১। বিশেষ পরিবেশ ও প্রয়োজনের বাইরে যখন ভাষা ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে কী ভাষা বলে?

ক. প্রমিত ভাষা খ. সামাজিক ভাষা গ. উপভাষা ঘ. কথ্যভাষা

৩২। ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয় যে-ভাষারূপের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তাকে কী ভাষা বলে?

ক. প্রমিত ভাষা খ. ব্যক্তিভাষা গ. উপভাষা ঘ. কথ্যভাষা

৩৩। সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণির ভাষাকে কী ভাষা বলে?

ক. প্রমিত ভাষা খ. সামাজিক ভাষা গ. উপভাষা ঘ. কথ্যভাষা

৩৪। সামাজিক ভাষা কত প্রকার?

ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৩৫। অভিজাতদের ভাষাকে কী ভাষা বলে?

ক উচ্চশ্রেণির ভাষা খ উচ্চ ভাষা গ অভিজাত ভাষা ঘ সম্ভ্রান্ত শ্রেণির ভাষা

৩৬। সামাজিক সুযোগ-সুবিধা যারা কম লাভ করেছে, শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ যারা তেমন পায়নি, যারা নিরক্ষর, আর্থিক দিক থেকে তেমন সচ্ছল নয়— তাদের ভাষাকে কী ভাষা বলে?

ক. নিম্নভাষা খ. নিম্নশ্রেণির ভাষা গ. অশিষ্টজনের ভাষা ঘ. সাধারণের ভাষা

৩৭। সমাজের কোনো বিশেষ পেশার মানুষের ভাষাবৈচিত্র্যকে কী ভাষা বলে?

ক. প্রমিত ভাষা খ. সামাজিক ভাষা গ. উপভাষা ঘ. পেশাগত ভাষা

৩৮। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য যেকোনো ভাষাকে বলা হয়–

i. দ্বিতীয় ভাষা

ii. তৃতীয় ভাষা

iii. বিদেশি ভাষা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৩৯। বাংলা লিখিত ভাষা যখন উদ্ভাবিত হয় তখন উদ্ভাবকরা বাংলা গদ্যের ভাষাকে যে রূপ দিয়েছিলেন, তাকে কী বলে?

ক. লেখার ভাষা খ. সাধুভাষা গ. চলিতভাষা ঘ. প্রমিত ভাষা

২. ধ্বনিতত্ত্ব

২.১ বাগ্‌যন্ত্র

ধ্বনির উচ্চারণে মানবশরীরের যেসব প্রত্যঙ্গ জড়িত সেগুলোকে একত্রে **বাগ্‌যন্ত্র** বা **বাকপ্রত্যঙ্গ** বলে। আমাদের শরীরের উপরের প্রত্যঙ্গগুলো বাগ্‌যন্ত্র হিসেবে পরিচিত। এগুলোর প্রধান কাজ দুটি– (ক) শ্বাসকার্য পরিচালনা করা এবং (খ) খাদ্য গ্রহণ করা। কিন্তু এসব প্রয়োজন সিদ্ধ করেও বাগ্‌যন্ত্র মানুষের ভাষিক কাজ করে থাকে। বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে আমরা ধ্বনি উৎপাদন করি। বাগ্‌যন্ত্রের এলাকা বিস্তৃত।এর মধ্যে রয়েছে ফসুফুস, শ্বাসনালি, স্বরযন্ত্র,স্বরতন্ত্র,জিভ, ঠোঁট, নিচের চোয়াল, দাঁত তালু ও গলনালি। এ ছাড়াও রয়েছে মধ্যচ্ছদা ও চিবুক।
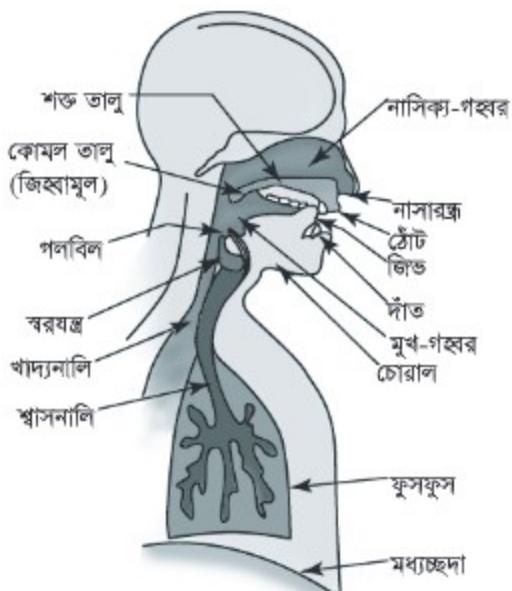
চিত্র : ২.১ : বাগ্‌যন্ত্র

২.২ স্বরধ্বনি

যে-বাগ্‌ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-আগত বাতাস মুখের মধ্যে কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় না, সেগুলোই হলো স্বরধ্বনি। যেমন– অ, আ, ই, উ। কিছু স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস বাধাহীনভাবে একই সঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে বের হয়। যেমন– আঁ, ইঁ, এঁ, ওঁ ইত্যাদি।

২.২ স্বরধ্বনির উচ্চারণ

স্বরধ্বনির উচ্চারণে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপুর্ণ। এগুলো হলো **জিভের উচ্চতা**, **জিভের অবস্থান** ও **ঠোঁটের আকৃতি**। এ ছাড়া আরও একটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হয়, তা হলো **কোমল তালুর অবস্থা**। কোমল তালুর অবস্থা অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলোকে **মৌখিক** ও **অনুনাসিক** স্বরধ্বনি হিসেবে উচ্চারণ করতে হয়।

২.২.১ জিভের অবস্থা

জিভের যে-অংশের সাহায্যে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেই অংশকে গুরুত্ব দিয়ে স্বরধ্বনিগুলোকে যথাক্রমে (ক) সম্মুখ, (খ) মধ্য ও (গ) পশ্চাৎ ধ্বনি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ক) **সম্মুখ স্বরধ্বনি :** জিভের সামনের অংশের সাহায্যে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলো হলো **সম্মুখ স্বরধ্বনি**। ই, এ, অ্যা স্বর এজাতীয়।

খ) **মধ্য-স্বরধ্বনি :** জিভ স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে অর্থাৎ, সামনে কিংবা পেছনে না-সরে যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেগুলো হলো **মধ্য-স্বরধ্বনি**। আ স্বরধ্বনি এ-শ্রেণির।

গ) **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি :** এজাতীয় স্বরধ্বনিগুলো জিভের পেছনের অংশের সাহায্যে উচ্চারণ করতে হয়। যেমন– অ, ও, উ।

২.২.২ জিভের উচ্চতা

জিভের উচ্চতা অনুসারে স্বরধ্বনিগুলোকে (ক) উচ্চ, (খ) নিম্ন , (গ) উচ্চ-মধ্য ও (ঘ) নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি হিসেবে নির্দেশ করা হয়।

ক) **উচ্চ-স্বরধ্বনি :** এগুলোর উচ্চারণের সময় জিভ সবচেয়ে উপরে ওঠে। যেমন– ই, উ।

খ) **নিম্ন-স্বরধ্বনি :** জিভ সবচেয়ে নিচে অবস্থান করে এসব স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়। আ, এ এ-শ্রেণির ধ্বনির দৃষ্টান্ত।

গ) **উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি :** এজাতীয় স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ নিম্ন-স্বরধ্বনির তুলনায় উপরে এবং উচ্চ-স্বরধ্বনির তুলনায় নিচে থাকে। যেমন– এ, ও।

ঘ) **নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি :** এসব স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনির তুলনায় নিচে এবং নিম্ন-স্বরধ্বনি থেকে উপরে ওঠে। যেমন– অ্যা, ও।
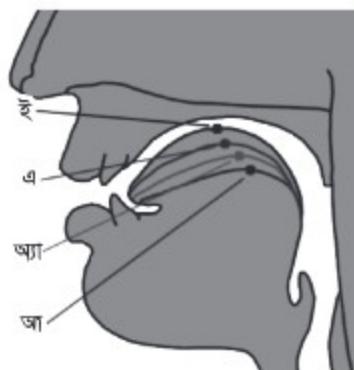
চিত্র - ২.২ : জিভের উচ্চতা অনুযায়ী স্বরধ্বনির উচ্চারণ

২.২.৩ ঠোঁটের অবস্থা

ঠোঁটের অবস্থা অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণে দু-ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়– ঠোঁট গোলাকৃত অথবা অগোলাকৃত অবস্থায় থাকতে পারে। ঠোঁটের এইসব অবস্থাভেদে স্বরধ্বনিগুলোকে **গোলাকৃত** ও **অগোলাকৃত** স্বরধ্বনি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁট গোলাকৃত হয়, সেই স্বরধ্বনিগুলোই হলো **গোলাকৃত স্বরধ্বনি**। যেমন– অ, ও, উ। অন্যদিকে যেসব স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট গোল না-হয়ে বিস্তৃত অবস্থায় থাকে, সেগুলোই হলো **অগোলাকৃত স্বরধ্বনি**। যেমন– ই, এ, অ্যা।
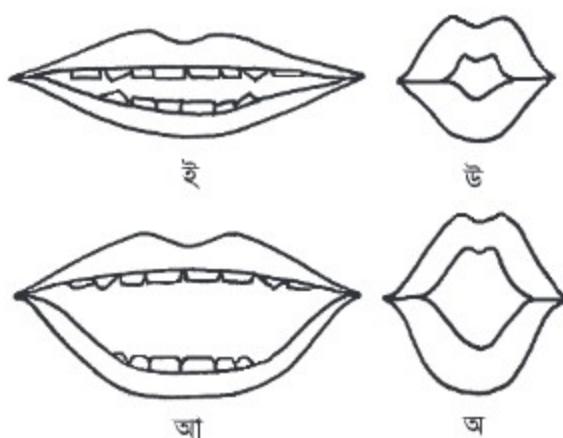
চিত্র : ২.৩ : ঠোঁটের অবস্থা ভেদে স্বরধ্বনি

২.২.৪ হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর

বিশ্বের বহু ভাষায় একই স্বরধ্বনির দুটি উপলব্ধি আছে। উচ্চারণকালে কিছু স্বরধ্বনি স্বল্পকাল স্থায়ী হয়, সে-তুলনায় অন্যগুলো অধিক সময় স্থায়ী হয়। দীর্ঘস্বর উচ্চারণের সময় আরও দুটি দিক খেয়াল করতে হবে– (ক) নিচের চোয়ালের মাংসপেশিতে বেশি চাপ পড়বে এবং (খ) মুখ দিয়ে হ্রস্ব স্বরের তুলনায় অধিক বাতাস বের হবে। স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে দুটি ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়। যেমন– ইংরেজি bit ও beat শব্দের উচ্চারণ। প্রথম শব্দের ই-ধ্বনি হ্রস্ব (i) আর দ্বিতীয় শব্দের ই দীর্ঘ (i) এবং এই দুই স্বর উচ্চারণের কারণে ইংরেজিতে দুটি ভিন্ন অর্থবাহী শব্দ তৈরি হয়েছে।

বাংলা ভাষার সব স্বরই হ্রস্ব: কিন্তু আমাদের লিখিত ভাষায় কিছু দীর্ঘ বর্ণ রয়েছে। আমরা লিখি 'নদী', 'তরী' ইত্যাদি। এসব শব্দের স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হয়তো করা যায়, কিন্তু তাতে দুটি ভিন্ন অর্থবাহী শব্দ তৈরি হয় না। অর্থাৎ লিখিত ভাষায় যা-ই থাকুক, আমাদের সব স্বরই হ্রস্ব।

২.২.৫ কোমল তালুর অবস্থা

মৌখিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস কেবল মুখ দিয়ে আর অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস একই সঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে বের হয়। জানা দরকার, কীভাবে বাতাস কখনো মুখ, এবং কখনো নাক ও মুখ দিয়ে একসঙ্গে বের হয়। আমাদের মুখের উপরে রয়েছে তালু। এটি দেখতে অনেকটা গম্বুজ-আকৃতির। এই তালুর সামনের অংশ শক্ত কিন্তু পেছনের অংশ নরম। বোঝাই যাচ্ছে যে, শক্ত প্রত্যঙ্গ স্থির, তা নড়াচড়া করতে পারে না। সে-ক্ষমতা আছে কেবল নরম অংশের। নরম বলেই তালুর পেছনের অংশকে বলে **কোমল তালু**। এ-তালুকে আমরা উপরে ওঠাতে পারি আবার নিচে নামাতে পারি। **মৌখিক স্বরধ্বনি** উচ্চারণের সময় তা উপরে উঠে গিয়ে নাক দিয়ে বাতাস বেরোনোর পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়।
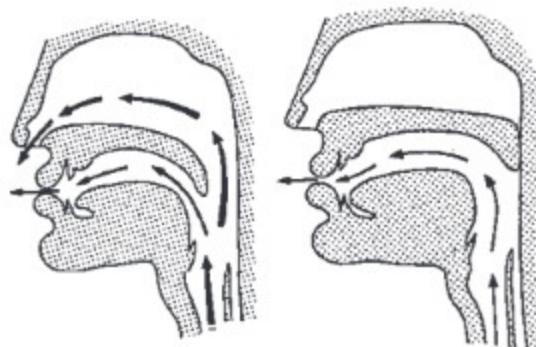
চিত্র : ২.৪ : মৌখিক ও অনুনাসিক ধ্বনির উচ্চারণ

অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় কোমল তালু নিচে নেমে যায়। এটি তখন এমন অবস্থায় থাকে যে, বাতাস একই সঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে বের হতে পারে। এভাবে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলোই হলো **অনুনাসিক স্বরধ্বনি**। বাতাস বের হওয়ার এই দুই ধরন অনুসারে স্বরধ্বনিগুলোকে ভাগ করা হয়েছে মৌখিক ও অনুনাসিক স্বরধ্বনি হিসেবে। মৌখিক স্বরের অনুনাসিক উচ্চারণ হলে শব্দের অর্থ বদলে যাবে। বাংলা মৌখিক স্বরধ্বনি সাতটি, অনুনাসিক স্বরধ্বনিও সাতটি। নিচের সারণিতে মৌখিক ও অনুনাসিক স্বরধ্বনিগুলো উল্লেখ করা হলো :

সারণি-০১: বাংলা মৌখিক ও অনুনাসিক স্বরধ্বনির তালিকা

	মৌখিক স্বর	উদাহরণ	অনুনাসিক স্বরধ্বনি	উদাহরণ	অর্থ
১	ই	বিধি	ইঁ	বিঁধি	'বিদ্ধ করা'
২	এ	এরা (সাধারণ)	এঁ	এঁরা	'তাঁরা' (সম্মানীয়)
৩	অ্যা	ট্যাক	অ্যাঁ	ট্যাঁক	'থলে'
৪	আ	বাধা (বিপত্তি)	আঁ	বাঁধা	'বন্ধন, আবদ্ধ করা
৫	অ	গদ (কবিতা)	অঁ	গঁদ	'আঠা'
৬	ও	ওরা (সাধারণ)	ওঁ	ওঁরা	'তাঁরা' (সম্মানীয়)
৭	উ	কুড়ি (সংখ্যা বিশেষ)	উঁ	কুঁড়ি	(ফুলের) 'কলি'

২.৩ ব্যঞ্জনধ্বনি

যেসব বাগ্‌ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস আগত বাতাস মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ বা রুদ্ধ হয় অথবা আংশিকভাবে বন্ধ হয় কিংবা সংকীর্ণ পথে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঘর্ষণের সৃষ্টি করে সেগুলোই হলো ব্যঞ্জনধ্বনি। কিছু ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস প্রথমে মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়, তারপর কেবল নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়। যেমন– প্ ক্ ল্ শ্ ম্ ন্।

২.৩. ১ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে দুটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল করতে হয়। এগুলো হলো ব্যঞ্জনধ্বনির **উচ্চারণস্থান** ও **উচ্চারণরীতি**। যে বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তা-ই উচ্চারণস্থান। উচ্চারণরীতি বলতে কীভাবে ধ্বনিটি উচ্চারণ করা হয় তাকে বোঝায়। অর্থাৎ ফুসফুস থেকে আগত বাতাস মুখের মধ্যে বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে কীভাবে বাধা পায় সে-সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট না হলে ধ্বনির প্রকৃত উচ্চারণ সম্ভব নয়। উচ্চারণরীতি আমাদের সে-ধারণা দান করে।

২.৩.২ উচ্চারণস্থান

উচ্চারণস্থান অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে দ্বি-ওষ্ঠ্য, দন্ত্য, দন্তমূলীয়, প্রতিবেষ্টিত, দন্তমূলীয়, তালব্য, জিহ্বামূলীয় ও কণ্ঠনালীয় ধ্বনি হিসেবে দেখানো হয়।

চিত্র : ২.৫ : উচ্চারণস্থান

২০২৫
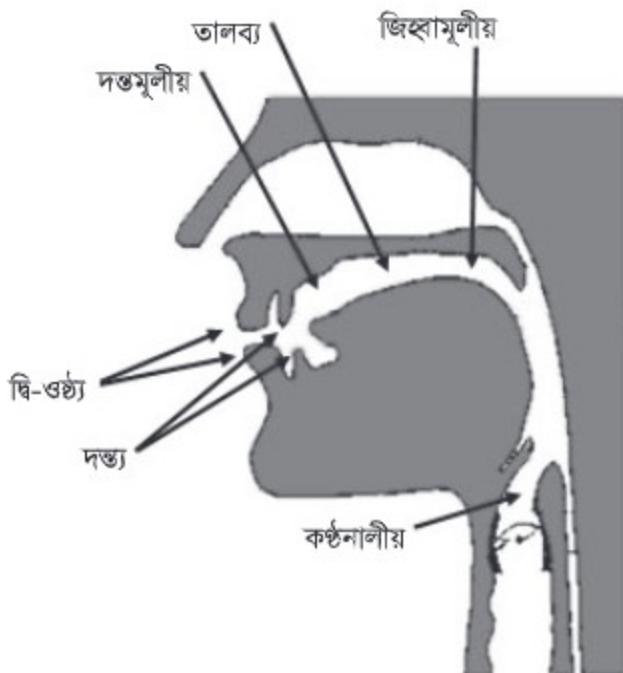
দ্বি-ওষ্ঠ্য : দুই ঠোঁট অর্থাৎ উপরের ও নিচের ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিগুলো হলো দ্বি-ওষ্ঠ্য। তাপ্, লাফ্, নাম্ শব্দের প্, ফ্, ম্ এ-শ্রেণি ধ্বনি।

দন্ত্য : জিভের সামনের অংশ দ্বারা উপরের পাটি দাঁতের নিচের অংশকে স্পর্শ করে দন্ত্য ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। বাংলা মত্, পথ্, পদ্, সাধ্ শব্দের ত্, থ্, দ্, ধ্ ধ্বনিগুলো এ জাতীয়।

দন্তমূলীয় : জিভের সামনের অংশ ও উপরের পাটি দাঁতের মূল বা নিচের অংশের সাহায্যে দন্তমূলীয় ধ্বনি উচ্চারিত হয়। কাস্তে, দান্, ঘর্, দল্ শব্দের স্, ন্, র্, ল্ ব্যঞ্জন এ-শ্রেণির। ন্ ধ্বনিকে দন্ত্য-ন এবং স্ ধ্বনিকে দন্ত্য-স হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এ দুটি ধ্বনির উচ্চারণে কোনোক্রমেই দাঁতের স্পর্শ নেই। আমরা 'কান' শব্দ উচ্চারণ করলেই তা বুঝতে পারি। শব্দটি উচ্চারণের সময় জিভের সামনের অংশ উপরের পাটি দাঁতের মূলকে স্পর্শ করে। একইভাবে 'বস্তা' কিংবা 'রাস্তা' শব্দের স্ উচ্চারণের সময় জিভের সামনের অংশ উপরের পাটি দাঁতের মূলের খুব কাছাকাছি আসে। সে-হিসেবে ন্ এবং স্ ব্যঞ্জনকে দন্ত্যমূলীয়-ন, দন্তমূলীয়-স বলাই বিজ্ঞানসম্মত।

তালব্য-দন্তমূলীয় : জিভের সামনের অংশ উপরের শক্ত তালু স্পর্শ করে তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন– টাক, কাঠ, ডাল, ঢাকা শব্দের ট্, ঠ্, ড্, ঢ্ ধ্বনি।

তালব্য : জিভ প্রসারিত হয়ে সামনের অংশ শক্ত তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত ধ্বনিগুলো হলো তালব্য। পচন, ছলনা, জাগরণ, ঝংকার, বাঁশ্ শব্দের চ্, ছ্, জ্, ঝ্, শ্ ধ্বনি তালব্য।

জিহ্বামূলীয় : জিভের পেছনের অংশ উঁচু হয়ে আলজিভের মূলের কাছাকাছি নরম তালু স্পর্শ করে জিহ্বামূলীয় ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয়। কাক্, লাখ্, দাগ্, গগন, বাঘ্, রঙ্ শব্দের ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ ধ্বনি এ-জাতীয়। এ ধ্বনিগুলোকে **কণ্ঠ্য** ধ্বনিও বলে।

কণ্ঠনালীয় : কণ্ঠনালির মধ্যে ধ্বনিবাহী বাতাস বাধা পেয়ে উচ্চারিত ধ্বনিগুলোই কণ্ঠনালীয়। এজাতীয় বাংলা ব্যঞ্জন মাত্র একটি -হ্।

সারণি-০২ : উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকা

উচ্চারণস্থান	ব্যঞ্জনধ্বনি
দ্বি-ওষ্ঠ্য	প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্
দন্ত্য	ত্, থ্, দ্, ধ্,
দন্তমূলীয়	ন্, র্, ল্, স্
তালব্য-দন্তমূলীয়	ট্, ঠ্, ড্, ঢ্
তালব্য	চ্, ছ্, জ্, ঝ্, শ্
জিহ্বামূলীয়	ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্
কণ্ঠনালীয়	হ্

২.৩.৩ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় প্রত্যঙ্গ

প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে দুটি বাগ্‌যন্ত্র জড়িত থাকে। একটি সক্রিয় এবং অন্যটি নিষ্ক্রিয়। যে বাগ্‌যন্ত্র সচল, অর্থাৎ যাকে আমরা ইচ্ছে মতো উপরে ওঠাতে বা নিচে নামাতে পারি, তাকে বলি সচল বাকপ্রত্যঙ্গ বা **সক্রিয় উচ্চারক**; আর যে-বাকপ্রত্যঙ্গ স্থির, অর্থাৎ নড়াচড়া করে না, তাকে বলি নিষ্ক্রিয় বাকপ্রত্যঙ্গ বা **নিষ্ক্রিয় উচ্চারক**। নিচে সারণিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থান অনুযায়ী সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উচ্চারকের পরিচয় দেওয়া হলো।

উচ্চারণস্থান	সক্রিয় উচ্চারক	নিষ্ক্রিয় উচ্চারক
দ্বি-ওষ্ঠ্য	নিচের ঠোঁট	উপরের ঠোঁট
দন্ত্য	জিভের ডগা	উপরের পাটির দাঁত
দন্তমূলীয়	জিভের ডগা	দন্তমূল
তালব্য-দন্তমূলীয়	জিভের পাতা	দন্তমূলের পেছনের অংশ
তালব্য	জিভের সামনের অংশ	শক্ত তালু
জিহ্বামূলীয়	জিভের পেছনের অংশ	কোমল তালু জিভের পেছনের অংশ যা আলজিভের নিচে রয়েছে।
কণ্ঠনালীয়	স্বরতন্ত্র	—

২.৩.৪ উচ্চারণরীতি

বিভিন্ন রকম বাগ্‌ধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁট, জিভ, জিহ্বামূল বিভিন্ন অবস্থান ও আকৃতি ধারণ করে। এসব বাক-প্রত্যঙ্গের আলোকে ধ্বনিবিচারের প্রক্রিয়াই উচ্চারণরীতি হিসেবে পরিচিত। অন্যভাবে বলা যায়, বায়ুপ্রবাহ কীভাবে বিভিন্ন বাকপ্রত্যঙ্গে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তা-ই হলো উচ্চারণরীতি। বায়ুপ্রবাহের এই বাধার প্রকৃতি বিচার করে, অর্থাৎ উচ্চারণরীতি অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে (১) স্পৃষ্ট/স্পর্শ, (২) ঘর্ষণজাত (৩) কম্পিত, (৪) তাড়িত, (৫) পার্শ্বিক ও নৈকট্যমূলক ধ্বনি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো।

১. **স্পৃষ্ট/স্পর্শ :** মুখের মধ্যে ফুসফুস-আগত বাতাস প্রথমে কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ রুদ্ধ বা বন্ধ হয় এবং এরপর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে উচ্চারিত ধ্বনিগুলোই হলো স্পৃষ্ট। যেমন– বক্‌ শব্দের ক্‌, পাট্‌ শব্দের ট্‌। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলো এভাবে দেখানো যায় :

ওষ্ঠ্য : প্‌ ফ্‌ ব্‌ ভ্‌ **দন্ত্য :** ত্‌ থ্‌ দ্‌ ধ্‌

তালব্য-দন্তমূলীয় : ট্‌ ঠ্‌ ড্‌ ঢ্‌ **তালব্য :** চ্‌ ছ্‌ জ্‌ ঝ্‌

জিহ্বামূলীয় : ক্‌ খ্‌ গ্‌ ঘ্‌

২. **নাসিক্য :** যেসব ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় বাতাস কেবল নাক দিয়ে বের হয়, সেগুলো হলো নাসিক্য ব্যঞ্জন। যেমন– আম্‌, ধান্‌, ব্যাঙ্‌ (ব্যাং) শব্দের ম্‌, ন্‌, ঙ্‌। উচ্চারণস্থান অনুসারে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো হলো :

দ্বি-ওষ্ঠ্য : ম্‌

দন্তমূলীয় : ন্‌

জিহ্বামূলীয় : ঙ্‌

৩. **ঘর্ষণজাত :** এজাতীয় বাগ্‌ধ্বনি উচ্চারণে বাগ্‌যন্ত্র দুটি খুব কাছাকাছি আসে; কিন্তু একসঙ্গে যুক্ত না-হওয়ায় একটি প্রায়-বদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে ফুসফুস-আগত বাতাস বাধা পায় ও সংকীর্ণ পথে বের হওয়ার সময় ঘর্ষণের সৃষ্টি করে। বাতাসের ঘর্ষণের ফলে উচ্চারিত হয় বলে এগুলোকে ঘর্ষণজাত ধ্বনি বলে। এই ঘর্ষণকে শিস দেওয়ার আওয়াজের সদৃশ ভেবে এগুলোকে **শিসধ্বনি** -ও বলে। বাংলা ঘর্ষণজাত ব্যঞ্জন তিনটি– স্‌, শ্‌ এবং হ্‌। আসমান, দাশ, হাট শব্দের উচ্চারণে আমরা এই ধ্বনিগুলো পাই। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী এই তিনটি ঘর্ষণজাত ধ্বনিকে এভাবে দেখানো যায় :

দন্তমূলীয় : স্‌

তালব্য : শ্‌

কণ্ঠনালীয় : হ্‌

৪. **কম্পিত :** জিভ কম্পিত হয়ে উচ্চারিত হয় বলে এজাতীয় ধ্বনিগুলোকে এ-পরিচয়ে চিহ্নিত করা হয়। বাংলা ভাষায় এ-শ্রেণির ধ্বনি মাত্র একটি র্‌।

৫. **তাড়িত :** এজাতীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় জিভের সামনের অংশ উলটে গিয়ে উপরের পাটি দাঁতের মূলে একটিমাত্র টোকা দেয়। সে-হিসেবে এগুলোকে **টোকাজাত ধ্বনি**ও বলে। বাংলা **বড়**, **গাঢ়** শব্দের ড়্, ঢ়্ ধ্বনি তাড়িত।

৬. **পার্শ্বিক :** এজাতীয় ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস জিভের পেছনের এক পাশ বা দু-পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং জিভ দাঁত অথবা দন্তমূলে অবস্থান করে। তাল্, শাল্, দল্ প্রভৃতি শব্দে আমরা যে ল্ ধ্বনি শুনি তা পার্শ্বিক।

২.৩.৫ ঘোষ ও অঘোষ ব্যঞ্জন

আমাদের গলার মধ্যে একটি বাকপ্রত্যঙ্গ আছে। একে বলে স্বরযন্ত্র। স্বরযন্ত্রের ভেতরে আরও দুটি প্রত্যঙ্গ রয়েছে– **স্বররন্ধ্র** ও **স্বরতন্ত্র**। কিছু বাগ্‌ধ্বনি উচ্চারণের সময় শেষের বাকপ্রত্যঙ্গটি, অর্থাৎ স্বরতন্ত্র কম্পিত হয়। স্বরতন্ত্রের কম্পনের ফলে উচ্চারিত ধ্বনিই হলো ঘোষ। স্বরধ্বনি সাধারণত ঘোষ হয়। কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে কখনো-কখনো ব্যতিক্রম ঘটে। কিছু ব্যঞ্জন উচ্চারণে স্বরতন্ত্র কম্পিত হয়। এগুলো হলো ঘোষ ব্যঞ্জন। আর যেগুলোর উচ্চারণে স্বরতন্ত্র কম্পিত হয় না, সেগুলো হলো অঘোষ ব্যঞ্জন। স্বরতন্ত্রের কম্পন অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে এভাবে উল্লেখ করা যায়– **অঘোষ** : ক্ খ্ চ্ ছ্ ত্ থ্ প্ ফ্; **ঘোষ** : গ্ ঘ্ ঙ্ জ্ ঝ্ ড্ ঢ্ দ্ ধ্ ন্ ব্ ভ্ ম্ র্ ল্ ড়্ ঢ়্ হ্।

চিত্র : ২.১৯: স্বরযন্ত্র ও স্বরতন্ত্র

২.৩.৬ মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি

যে-ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে মুখ দিয়ে অধিক বাতাস বের হয় ও নিচের চোয়ালের মাংসপেশিতে বেশি চাপ পড়ে সেগুলোই হলো **মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন**। এজাতীয় ধ্বনিগুলোকে অনেকে 'হ-কার জাতীয় ধ্বনি' বলেছেন। মহাপ্রাণ ধ্বনির বিপরীত ধ্বনিগুলোই হলো **অল্পপ্রাণ**। অর্থাৎ এসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখ দিয়ে কম বাতাস বের হয় এবং নিচের চোয়ালের মাংসপেশিতে কম পড়ে। প্ এবং ফ্ ধ্বনি পরপর উচ্চারণ করলেই বোঝা যায় যে, প্ উচ্চারণকালে মুখ দিয়ে কম বাতাস বের হয় ও নিচের মাংসপেশিতে কম চাপ পড়ে। এখন মুখগহ্বরের

সামনে হাত রেখে ফ্ উচ্চারণ করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ধ্বনিটি উচ্চারণের সময় মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বাতাসের পরিমাণ আগের তুলনায় বেশি এবং নিচের চোয়ালের মাংসপেশিতে অধিক চাপ প্রয়োগ করতে হচ্ছে।

	উচ্চারণরীতি	ব্যঞ্জন
১	স্পৃষ্ট	প্ ফ্ ব্ ভ্, ত্ থ্ দ্ ধ্, চ্ ছ্ জ্ ঝ্, ট্ ঠ্ ড্ ঢ্, ক্ খ্ গ্ ঘ্
২	নাসিক্য	ঙ্ ম্ ন্
৩	ঘর্ষণজাত	স্ শ্ হ্
৪	কম্পিত	র্
৫	তাড়িত	ড়্ ঢ়
৬	পার্শ্বিক	ল্
৭	নৈকট্য	অন্তস্থ ব্, অন্তস্থ য়

২.৪ বাংলা স্বরধ্বনির সংখ্যা

বাংলা ভাষায় মৌখিক স্বরধ্বনি সাতটি। এগুলো হলো : ই, এ, অ্যা, আ, অ, উ, ও। এই সাতটি স্বরেরই সাতটি অনুনাসিক উপলব্ধি বা রূপ আছে। এগুলো হলো : ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, আঁ, অঁ, উঁ, ওঁ। মনে রাখতে হবে যে, মৌখিক স্বরের অনুনাসিক উচ্চারণ করলে দুটি ভিন্ন অর্থবাহী শব্দ তৈরি হবে। যেমন– 'বাধা' ও 'বাঁধা'। বাংলা মৌখিক ও অনুনাসিক স্বরধ্বনি মিলে স্বরধ্বনি ১৪টি।

২.৪.১ স্বরবর্ণ

বাংলা স্বরবর্ণ ১১টি। এগুলো হলো :

অ আ ই ঈ
উ ঊ ঋ
এ ঐ ও ঔ

এগুলোর কয়েকটি ধ্বনি নয়। আমরা আগেই বলেছি যে, বাংলায় কোনো দীর্ঘস্বর নেই। সে-হিসেবে ঈ, ঊ ধ্বনি নয়। একই কথা খাটে ঋ, ঐ, ঔ-এর বেলায়। ঋ বললে দুটি ধ্বনির উচ্চারণ আসে : র্ + ই (রি); অনুরূপভাবে ঐ-তে আসে ও + ই এবং ঔ-তে আসে ও + উ। এগুলোকে বলা যায় **দ্বৈতবর্ণ** (degraph)। ঋ-তে একটি ব্যঞ্জন ও একটি স্বর এবং ঐ, ঔ-তে দুটি করে স্বর আছে। এসব বর্ণ ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব না-করার কারণ কী? উত্তর খুব সহজ। ভাষা যেমন মানুষ একদিনে অর্জন করতে পারেনি, ভাষাকে লিখিত আকারে ধরে রাখার কৌশল আয়ত্ত করতেও মানুষের অনেক সময় লেগেছে। লেখার প্রয়োজনে একটি ধ্বনি বোঝানোর জন্য একাধিক বর্ণ উদ্ভাবন ও ব্যবহার করতে হয়েছে। তারপর দীর্ঘকাল ব্যবহারের মাধ্যমে লিখনব্যবস্থার সংস্কার করতে হয়েছে। বিশ্বে কোনো ভাষাতে ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে এক-এক বা সুষম সম্পর্ক নেই। আমরা যা বলি, লিখিত ভাষায় তা সেভাবে লেখা হয় না। আমাদের ভাষার অনেক শব্দ ও ভাষিক উপাদান সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। এগুলোর পরিচয় যেমন ভিন্ন, তেমনি লেখার ব্যবস্থাও পৃথক। লেখার এ-বিধি এখনো পরিবর্তন করা যায়নি। তা সম্ভবও নয়। ইংরেজি, লাতিন গ্রিক, জার্মান ইত্যাদি ভাষার শব্দ ও ভাষিক উপাদান রয়েছে। ইংরেজিভাষীরা লিখনপদ্ধতি শেখার সময় সেগুলো মূল ভাষার বানানসহই শেখে এবং সেভাবে লেখে। আমাদেরও এগুলো জানতে হবে, শিখতে হবে সংস্কৃত শব্দগুলো এবং সেসব শব্দ লেখার নিয়মনীতি। (বাংলা বানান অংশে এ-সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)

২.৫ কার ও ফলা

বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণের দুটি রূপ আছে– একটি পূর্ণরূপ, অন্যটি হলো সংক্ষিপ্তরূপ বা **কার**।

স্বরবর্ণের পূর্ণরূপ

স্বরবর্ণ যখন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর পূর্ণরূপ লেখা হয়। যেমন– অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ। স্বরবর্ণের পূর্ণরূপ শব্দের শুরুতে, মাঝে, শেষে– তিন অবস্থানেই থাকতে পারে। যেমন–

শব্দের শুরুতে : অলংকার, আকাশ, ইলিশ, উপকার, এলাচ, ঐক্য, ওল, ঔপন্যাসিক।
শব্দের মাঝে : কুরআন, বইচি, আউশ।
শব্দের শেষে : সেমাই, জামাই, বউ।

স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্তরূপ

স্বরধ্বনি যখন ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ বা কার ব্যবহৃত হয়। নিচে উদাহরণ দেওয়া হলো :

আ-কার– া : বাবা
ই-কার– ি : নিশি
ঈ-কার– ী : মনীষী
উ-কার– ু : ভুল
ঊ-কার– ূ : দূর
ঋ-কার– ৃ : পৃথিবী
এ-কার– ে/ে : জেলে
ঐ-কার– ৈ/ৈ : হৈ চৈ
ও-কার– ো/ো : ঢোল
ঔ-কার– ৌ/ৌ : মৌন।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা ৩২টি। এগুলো হলো :

ক খ গ ঘ ঙ = ৫
চ ছ জ ঝ = ৪
ট ঠ ড ঢ = ৪
ত থ দ ধ ন = ৫
প ফ ব ভ ম = ৫
র ল শ স = ৪
হ ড় ঢ় = ৩
অন্তস্থ য়, অন্তস্থ ব = ২
মোট = ৩২

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের যে-তালিকা আমরা পাই তাতে বর্ণ রয়েছে ৩৯টি। এগুলো হলো :

বর্ণ	সংখ্যা
ক খ গ ঘ ঙ	= ৫
চ ছ জ ঝ ঞ	= ৫
ট ঠ ড ঢ ণ	= ৫
ত থ দ ধ ন	= ৫
প ফ ব ভ ম	= ৫
য র ল	= ৩
শ ষ স হ	= ৪
ড় ঢ় য় ৎ	= ৪
ং ঃ ঁ	= ৩
মোট	**= ৩৯**

ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে এ-তালিকা মিলিয়ে দেখলে আমরা পাচ্ছি অতিরিক্ত ৮টি বর্ণ– ঞ, য, ণ, ষ, ৎ, ং, ঃ, ঁ। এগুলো কোনো ধ্বনি প্রকাশ করে না। ন এবং ণ-এর উচ্চারণ অভিন্ন। যেমন– বান, বাণ। লিখিত ভাষায় এ দুয়ের অর্থ আলাদা, একটি 'বন্যা', আরেকটি 'তীর'। ষ-এর উচ্চারণ শ-এর মতো। বানানে 'ভাষা' লিখলেও উচ্চারণ করতে হয় 'ভাশা'। ত এবং ৎ-এর উচ্চারণ একই। যেমন– 'মত', 'সৎ'। ঙ, ং-এর উচ্চারণেও কোনো পার্থক্য নেই। যেমন– 'ব্যাঙ'/'ব্যাং'। বিসর্গ (ঃ) এবং চন্দ্রবিন্দু (ঁ) স্বতন্ত্র বর্ণ নয়। এগুলো ধ্বনি প্রকাশের বা উচ্চারণ-নির্দেশের **অণুচিহ্ন**। আরবিতে যেমন হরকত আছে এগুলো তেমনি। ঞ-এর উচ্চারণ কখনো অঁ যেমন– মিঞা (মিয়াঁ) মিঞ (মিয়োঁ), কখনো দন্তমূলীয় ন্ ধ্বনির মতো, যেমন– ব্যঞ্জন (ব্যান্জোন্), লাঞ্ছনা (লান্ছোনা)। বিসর্গের (ঃ) সাহায্যে ধ্বনির দ্বিত্ব উচ্চারণ বোঝায়। যেমন–'অতঃপর' উচ্চারণ করতে হয় অতোপ্পর্; প্রাতঃরাশ>প্রাতোর্রাশ্। অনুরূপ নির্দেশ ব্যঞ্জনের নিচে অন্তস্থ-ব (ব়) দিয়ে করা হয়। যেমন– বিশ্ব>বিশ্শো; অশ্ব>অশ্শো। চন্দ্রবিন্দুর সাহায্যে স্বরের অনুনাসিকতা বোঝায়। যেমন– আ>আঁ; ই>ইঁ; উ>উঁ। 'য' এর উচ্চারণ 'জ' এর মত। যেমন : যদি>জদি; যাই.জাই।

২.৬ ব্যঞ্জনবর্ণ

ব্যঞ্জনধ্বনি প্রকাশের জন্য যেসব বর্ণ ব্যবহার করা হয় সেগুলোই ব্যঞ্জনবর্ণ। বাংলা ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণগুলো লেখার সময় কয়েকভাবে লেখা হয়। তখন এগুলোকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়। নিচে এসব আলোচনা করা হলো।

ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ণরূপ

ব্যঞ্জনবর্ণ যখন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর পূর্ণরূপ লেখা হয়। ব্যঞ্জবর্ণের পূর্ণরূপ শব্দের শুরুতে, মাঝে, শেষে– তিন অবস্থানে থাকতে পারে। যেমন–

শব্দের শুরুতে : কলম, খাতা, গগন, ঘর।

শব্দের মাঝে : পাগল, সকল, সজল, সাঁঝ।

শব্দের শেষে : অলক, বাঘ, বৈশাখ, রোগ।

ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্তরূপ

স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয়, তেমনি কিছু ব্যঞ্জনবর্ণ কিছু স্বরবর্ণ কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয় এবং সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে **ফলা** বলে। যে-ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয় তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ হয়। যেমন–

ম-এ য-ফলা : ম্য

ম-এ র-ফলা : ম্র

ম-এ ল-ফলা : ম্ল

ম-এ ব-ফলা : ম্ব।

ফলার রূপ এরকম :

য-ফলা (্য) : ব্যাঙ, ধান্য, সহ্য

ব-ফলা (্ব) : শ্বাস, বিল্ব, অশ্ব

ম-ফলা (্ম) : পদ্ম, সম্মান, স্মরণ

র-ফলা (্র) : প্রমাণ, শ্রান্ত, ক্ষিপ্র

ন-ফলা (্ন) : রত্ন, স্বপ্ন, যত্ন

ল-ফলা (্ল) : অম্ল, ম্লান, ক্লান্ত।

২.৭ যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ও বিশ্লেষণ

দুই বা তার চেয়ে বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনি দুটি একত্রে লেখা হয়। যেমন– ব্ + অ + ক্ + ত্ + আ = বক্তা। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ ক্ + ত-এর মূল রূপ পরিবর্তিত হয়ে ক্ত হয়েছে। যুক্তব্যঞ্জন কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন– দ্বিত্ব ব্যঞ্জন, সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন।

ক) **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন :** একই ব্যঞ্জন পরপর দুবার ব্যবহৃত হলে তাকে **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন** বলে। যেমন– উচ্চ (চ+চ), বিপন্ন (ন+ন), সজ্জন (জ্+জ), সম্মান (ম্+ম)।

খ) **সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন :** ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ছাড়া সব ব্যঞ্জনসংযোগকে সাধারণ **যুক্তব্যঞ্জন** বলে। যেমন–

লক্ষ (ক+ষ), বক্র (ক+র), পন্থা (ন+থ), বন্ধ (ন+ধ)। কয়টি ব্যঞ্জন যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন কয়েক রকমের হয়। যেমন–

দুটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : ক্+ত=ক্ত –রক্ত, দ্+ধ=দ্ধ–বৃদ্ধ।

তিনটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : জ্+জ্+ব=জ্জ্ব –উজ্জ্বল, ম্+প্+র=ম্প্র–সম্প্রদান।

চারটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : ন্+ত্+র+য=ন্ত্র্য –স্বাতন্ত্র্য।

চেনা বা শনাক্তকরণের সুবিধা বা অসুবিধার দিক থেকে যুক্তব্যঞ্জন দু-প্রকারে নির্দেশ করা হয়– (ক) স্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন ও (খ) অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন। যেসব যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যকার প্রতিটি বর্ণের রূপ স্পষ্ট, সেগুলোকে **স্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন** বলে। যেমন–

ঙ্খ (ঙ্+খ) : শঙ্খ, পঙ্খী।
স্ত (স্+ত) : রাস্তা, সমস্ত।
ম্প (ম্+প) : কম্পন, কম্পিউটার।
শ্চ (শ্+চ) : পশ্চিম, আশ্চর্য।
ন্দ (ন্+দ) : আনন্দ, সুন্দর।

যেসব যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যকার সব কটি বা কোনো কোনো বর্ণের রূপ স্পষ্ট নয়, সেগুলোকে **অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন** বলে। যেমন –

ক্র (ক্+র) : আক্রমণ, চক্র।
ক্ষ (ক্+ষ) : শিক্ষা, লক্ষ।
হ্ম (হ্+ম) : ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ।
গ্ধ (গ্+ধ) : দুগ্ধ, মুগ্ধ।
ত্র (ত্+র) : পত্র, নেত্র।
ত্থ (ত্+থ) : উত্থান, উত্থিত।
হ্ন (হ্+ন) : অহ্ন, বহ্নি।
ষ্ণ (ষ্+ণ) : উষ্ণ, তৃষ্ণা।
ঞ্জ (ঞ্+জ) : গঞ্জ, সঞ্জয়।
জ্ঞ (জ্+ঞ) : অজ্ঞ, বিজ্ঞান।
ঞ্চ (ঞ্+চ) : পঞ্চাশ, মঞ্চ।

যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বিশ্লেষণ

যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে বিশ্লেষণ করাই যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বিশ্লেষণ। যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলো বিশ্লেষণ করলে যে রূপ পাওয়া যায় তা নিচে দেখানো হলো :

ক্ত=ক্+ত : শক্ত, রক্ত
ক্র=ক্+র : বক্র, শুক্র
ক্ষ=ক্+ষ : বক্ষ, দক্ষ
ঙ্ক=ঙ্+ক : অঙ্ক, কঙ্কাল
ঙ্খ=ঙ্+খ : শঙ্খ, পঙ্খী
ঙ্গ=ঙ্+গ : অঙ্গ, বঙ্গ

জ্ঞ=জ্+ঞ : জ্ঞান, সংজ্ঞা

ঞ্চ=ঞ্+চ : বঞ্চনা, মঞ্চ

ঞ্ছ=ঞ্+ছ : বাঞ্ছনীয়, লাঞ্ছনা

ঞ্জ=ঞ্+জ : গঞ্জনা, ভঞ্জন

ট্ট=ট্+ট : অট্টালিকা, চট্টগ্রাম

ণ্ড=ণ্+ড : কাণ্ড, গণ্ডা

ত্ত=ত্+ত : মত্ত, বিত্ত

ত্র=ত্+র : পত্র, সূত্র

ত্রু=ত্+র্+উ : ত্রুটি, শত্রু

ত্থ=ত্+থ : উত্থান, উত্থিত

দ্ধ=দ্+ধ : যুদ্ধ, বদ্ধ

ন্ধ=ন্+ধ : অন্ধ, বন্ধ

ভ্র=ভ্+র : ভ্রমণ

ভ্রূ=ভ্+র+ঊ : ভ্রূকুটি

রু=র্+উ : রুমাল, রুদ্ধ, রুপালি, রুপা

রূ=র্+ঊ : রূপ, রূপসী, রূপকথা

শু=শ্+উ : শুভ, শুদ্ধ

শ্রু=শ্+র্+উ : অশ্রু, শ্রুতি

শ্রূ=শ্+র্+ঊ : শুশ্রূষা

ষ্ম=ষ্+ম : গ্রীষ্ম, ভষ্ম

ষ্ণ=ষ্+ণ : উষ্ণ, তৃষ্ণা

স্ত=স্+ত : প্রশস্ত, সস্তা

স্থ=স্+থ : অসুস্থ, স্বাস্থ্য

হু=হ্+উ : হুকুম, বহু

হৃ=হ্+ঋ : হৃদয়, সুহৃদ

হ্ন=হ্+ন : বহ্নি, সায়াহ্ন

হ্ণ=হ্+ণ : অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ

২.৮ ধ্বনি-পরিবর্তন : সন্ধি

পূর্বের ও পরের ধ্বনির প্রভাবে ধ্বনির যে-পরিবর্তন তা-ই **ধ্বনি-পরিবর্তন**। যেমন– এক (অ্যা) + টি = একটি – একটি শব্দের পূর্বের ধ্বনিটি হলো অ্যা আর পরের ধ্বনিটি ই। স্বরধ্বনি দুটি উচ্চারণের দিক থেকে এক শ্রেণির নয়। অ্যা হলো নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি আর ই হলো উচ্চ-স্বরধ্বনি। এখানে সেভাবেই অ্যা + ই = অ্যা>এ হয়েছে। সন্ধিতে এভাবেই ধ্বনি পরিবর্তিত হয়। সন্ধি শব্দের অর্থই হলো মিলন। অর্থাৎ দুটি ধ্বনি মিলে একটি ধ্বনি হয়। যেমন– মহা + আকাশ = মহাকাশ; দিক + অন্ত = দিগন্ত। প্রথম উদাহরণে আ + আ = আ এবং দ্বিতীয় উদাহরণে ক + অ = ক>গ হয়েছে।

সন্ধির ফলে ধ্বনি কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা ধ্বনিতাত্ত্বিক **প্রতিবেশ** লক্ষ করলে বোঝা যায়। এখানে দুটি প্রতিবেশের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই– (ক) একই শব্দের মধ্যে পরিবর্তন বা মিলন এবং (খ) দুটি শব্দের মধ্যে পরিবর্তন বা মিলন। উপরের দৃষ্টান্তের 'একটি' শব্দের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির পরিবর্তন ঘটেছে। 'বিদ্যালয়' শব্দে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবর্তন বা মিলন দেখি– বিদ্যা + আলয় (আ+আ=আ)। সন্ধিকে ধ্বনির পরিচয় অনুযায়ী ভাগ করতে গিয়ে তার দুটি বিভাগ নির্দেশ করা হয়– **স্বরসন্ধি** ও **ব্যঞ্জনসন্ধি**। নিচে এ-বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

স্বরসন্ধি : ধ্বনির পরিবর্তন বা মিলন যখন স্বরধ্বনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে বলে স্বরসন্ধি। যেমন– হিত + অহিত = হিতাহিত (অ + অ = আ)

ব্যঞ্জনসন্ধি : স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন– মুখ+ছবি = মুখচ্ছবি (অ+ছ=চ্ছ); উৎ+চারণ = উচ্চারণ (ত্+চ=চ্চ)।

২.৮.১ স্বরসন্ধি : সূত্র ও উদাহরণ

বাংলা ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দগুলোর সন্ধির নিয়ম ঐ ভাষার ব্যাকরণ দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। এগুলো আমাদের সেভাবেই শিখতে ও ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণে এগুলো সেভাবেই দেখানো হলো :

১. অ-ধ্বনির পরে অ থাকলে উভয়ে মিলে আ হয়। যেমন– অ+অ=আ : নব+অন্ন=নবান্ন; সূর্য+অস্ত=সূর্যাস্ত।

২. অ-এর পরে আ থাকলে উভয়ে মিলে আ হয়। যেমন– অ+আ=আ : হিম+আলয়=হিমালয়; গ্রন্থ+আগার=গ্রন্থাগার।

৩. আ-এর পরে অ থাকলে উভয়ে মিলে আ হয়। যেমন– আ+অ=আ : তথা+অপি=তথাপি; মহা+অর্ঘ=মহার্ঘ।

৪. আ-এর পরে আ থাকলে উভয়ে মিলে আ হয়। যেমন– আ+আ=আ : মহা+আশয়=মহাশয়; কারা+আগার=কারাগার।

৫. ই+ই=ঈ। যেমন– অতি+ইত=অতীত; রবি+ইন্দ্র-রবীন্দ্র ।

৬. ই-ধ্বনির পরে ঈ থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-ধ্বনি হয়। যেমন– ই+ঈ=ঈ : পরি+ঈক্ষা=পরীক্ষা; প্রতি+ঈক্ষা=প্রতীক্ষা।

৭. ঈ-ধ্বনির পরে ই থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-ধ্বনি হয়। যেমন– ঈ+ই=ঈ : সুধী+ইন্দ্র=সুধীন্দ্র; শচী+ইন্দ্র=শচীন্দ্র।

৮. ঈ ধ্বনির পর ঈ থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-ধ্বনি হয়। যেমন– ঈ+ঈ=ঈ : সতী+ঈশ=সতীশ; শ্রী+ঈশ=শ্রীশ।

৯. অ বা আ ধ্বনির পরে ই বা ঈ-ধ্বনি থাকলে উভয়ে মিলে এ-ধ্বনি হয়। যেমন– অ+ই=এ স্ব+ইচ্ছা=স্বেচ্ছা; শুভ+ইচ্ছা=শুভেচ্ছা।

১০. অ+ঈ=এ। যেমন– অপ+ঈক্ষা=অপেক্ষা; নর+ঈশ=নরেশ।

১১. আ+ই=এ। যেমন– যথা+ইচ্ছা=যথেচ্ছা।

১২. আ+ঈ=এ। যেমন– মহা+ঈশ=মহেশ, ঢাকা+ঈশ্বরী=ঢাকেশ্বরী।

২.৮.২ সন্ধির প্রয়োজনীয়তা

সন্ধির মাধ্যমে উচ্চারণে স্বাচ্ছন্দ্য আসে এবং শ্রুতিমাধুর্য বাড়ে। সন্ধি ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

ঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও :

১। ধ্বনির উচ্চারণে মানবশরীরের যেসব প্রত্যঙ্গ জড়িত, সেগুলোকে একত্রে কী বলে?

ক. শ্বাসনালি খ. স্বরযন্ত্র গ. গলনালি ঘ. বাগ্‌যন্ত্র

২। আমাদের শরীরের উপরের প্রত্যঙ্গগুলোর প্রধান কাজ–

i. শ্বাসকার্য পরিচালনা করা
ii. খাদ্য গ্রহণ করা
iii. কথা বলা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৩। বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কী উৎপাদন করি?

ক. ধ্বনি খ. বর্ণ গ. শব্দ ঘ. বাক্য

৪। বাগ্‌যন্ত্র তৈরি হয়–

i. ফসুফুস, শ্বাসনালি, স্বরযন্ত্র দিয়ে
ii. স্বরতন্ত্র, জিভ, ঠোঁট, নিচের চোয়াল দিয়ে
iii. দাঁত, তালু, গলনালি, মধ্যচ্ছদা, চিবুক দিয়ে

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৫। যে-বাগ্ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-আগত বাতাস মুখের মধ্যে কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় না, সেগুলোকে কী বলে?

ক. স্বরধ্বনি খ. স্বরবর্ণ গ. ব্যঞ্জনধ্বনি ঘ. ব্যঞ্জনবর্ণ

৬। কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস বাধাহীনভাবে একই সঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে বের হয়?

ক. অ খ. আ গ. ই ঘ. উ

৭। স্বরধ্বনির উচ্চারণে কয়টি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ?

ক. দুটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৮। স্বরধ্বনির উচ্চারণে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো–

i. জিভের উচ্চতা

ii. জিভের অবস্থান

iii. ঠোঁটের আকৃতি

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৯। কোমল তালুর অবস্থা অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলোকে যে জাতীয় স্বরধ্বনি হিসেবে উচ্চারণ করতে হয় তা হলো–

i. মৌখিক স্বরধ্বনি

ii. অনুনাসিক স্বরধ্বনি

iii. সম্মুখ স্বরধ্বনি

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

১০। জিভের সামনের অংশের সাহায্যে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলোকে কী বলে?

ক. সম্মুখ স্বরধ্বনি খ. মধ্য-স্বরধ্বনি গ. পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ঘ. নিম্ন-স্বরধ্বনি

১১। জিভ স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে, অর্থাৎ সামনে কিংবা পেছনে না-সরে যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেগুলোকে কী বলে?

ক. সম্মুখ স্বরধ্বনি খ. মধ্য-স্বরধ্বনি গ. পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ঘ. নিম্ন-স্বরধ্বনি

১২। জিভের পেছনের অংশের সাহায্যে উচ্চারণ করতে হয় যে-স্বরধ্বনি তাকে কী বলে?

ক. সম্মুখ স্বরধ্বনি খ. মধ্য-স্বরধ্বনি গ. পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ঘ. নিম্ন-স্বরধ্বনি

১৩। জিভ সবচেয়ে উপরে উঠিয়ে যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে হয় তাকে কী বলে?

ক. উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি খ. নিম্ন-স্বরধ্বনি গ. উচ্চ স্বরধ্বনি ঘ. নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি

১৪। জিভ সবচেয়ে নিচে অবস্থান করে যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে হয় তাকে কী বলে?

ক. উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি খ. নিম্ন-স্বরধ্বনি গ. উচ্চ স্বরধ্বনি ঘ. নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি

১৫। জিভ নিম্ন-স্বরধ্বনির তুলনায় উপরে এবং উচ্চ-স্বরধ্বনির তুলনায় নিচে থেকে যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে হয়, তাকে কী বলে?

ক. উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি খ. নিম্ন-স্বরধ্বনি গ. উচ্চ স্বরধ্বনি ঘ. নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি

১৬। জিভ উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনির তুলনায় নিচে এবং নিম্ন-স্বরধ্বনি থেকে উপরে উঠে যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে হয়, তাকে কী বলে?

ক. উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি খ. নিম্ন-স্বরধ্বনি গ. মধ্য স্বরধ্বনি ঘ. নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি

১৭। ঠোঁটের অবস্থা অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণে কয় ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়?

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

১৮। স্বরধ্বনি তৈরির সময় হাঁ করার উপর নির্ভর করে যে-স্বরধ্বনিগুলো গঠিত হয়, সেগুলো হলো–

i. বিবৃত

ii. অর্ধ-বিবৃত

iii. সংবৃত

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

১৯। যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁট গোলাকৃত হয় সেই স্বরধ্বনিগুলোকে কী বলে?

ক. গোলাকৃত স্বরধ্বনি খ. অগোলাকৃত স্বরধ্বনি গ. সংবৃত স্বরধ্বনি ঘ. বিবৃত স্বরধ্বনি

২০। গোলাকৃত স্বরধ্বনি কোনটি?

ক. অ খ. আ গ. ই ঘ. এ

২১। যেসব স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট গোল না-হয়ে বিস্তৃত অবস্থায় থাকে, সেগুলোকে কী বলে?

ক. গোলাকৃত স্বরধ্বনি খ. অগোলাকৃত স্বরধ্বনি গ. সংবৃত স্বরধ্বনি ঘ. বিবৃত স্বরধ্বনি

২২। অগোলাকৃত স্বরধ্বনি কোনটি?

ক. অ খ. আ গ. এ ঘ. ও

২৩। বাংলার সব স্বর–

i. হ্রস্ব

ii. দীর্ঘ

iii. কোনোটি নয়

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২৪। তালুর পেছনের অংশকে বলে–

i. শক্ত তালু

ii. কোমল তালু

iii. কোনোটি নয়

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২৫। একই সঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে বের হয়ে যে-ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে কী বলে?

ক. উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি খ. অনুনাসিক স্বরধ্বনি গ. মৌখিক স্বরধ্বনি ঘ. নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি

২৬। কোন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস প্রথমে মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ হয় তারপর কেবল নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়?

ক. খ্ খ. ল্ গ. ট্ ঘ. থ্

২৭। ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে যে বিষয়ের উপর বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে তা হলো–

i. উচ্চারণস্থান

ii. উচ্চারণরীতি

iii. কোনোটি নয়

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২৮। উচ্চারণস্থান অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে যে ধ্বনি হিসেবে দেখানো হয়, তা হলো–

i. দ্বি-ওষ্ঠ্য, দন্ত্য

ii. দন্তমূলীয়, প্রতিবেষ্টিত, তালব্য-দন্তমূলীয়

iii. তালব্য, জিহ্বামূলীয়, কণ্ঠনালীয়

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২৯। উপরের ও নিচের ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিগুলোকে কী বলে?

ক. দন্তমূলীয় ধ্বনি খ. দন্ত্য ধ্বনি গ. দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি ঘ. তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনি

৩০। জিভের সামনের অংশ উপরের পাটি দাঁতের নিচের অংশকে স্পর্শ করে কোন ধ্বনি উচ্চারিত হয়?

ক. দন্তমূলীয় ধ্বনি খ. দন্ত্য ধ্বনি গ. দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি ঘ. তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনি

৩১। জিভের সামনের অংশ ও উপরের পাটি দাঁতের মূল বা নিচের অংশের সাহায্যে কোন ধ্বনি উচ্চারিত হয়?

ক. দন্তমূলীয় ধ্বনি খ. দন্ত্য ধ্বনি গ. দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি ঘ. তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনি

৩২। জিভের সামনের অংশ পেছনে কুঞ্চিত বা বাঁকা হয়ে কোন ধ্বনি উৎপাদিত হয়?

ক. প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি খ. দন্ত্য ধ্বনি গ. দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি ঘ. তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনি

৩৩। জিভের সামনের অংশ উপরে গিয়ে শক্ত তালু স্পর্শ করে কোন ধ্বনি উচ্চারিত হয়?

ক. প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি খ. দন্ত্য ধ্বনি গ. দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি ঘ. তালব্য-দন্তমূলীয় ধ্বনি

৩৪। জিভ প্রসারিত হয়ে সামনের অংশ শক্ত তালু স্পর্শ করে কোন ধ্বনি উচ্চারিত হয়?

ক. প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি খ. দন্ত্য ধ্বনি গ. দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি ঘ. তালব্য ধ্বনি

৩৫। জিভের পেছনের অংশ উঁচু হয়ে আলজিভের মূলের কাছাকাছি নরম তালু স্পর্শ করে কোন ধ্বনি উচ্চারিত হয়?

ক. জিহ্বামূলীয় ধ্বনি খ. দন্ত্য ধ্বনি গ. দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি ঘ. তালব্য ধ্বনি

৩৬। কণ্ঠনালির মধ্যে ধ্বনিবাহী বাতাস বাধা পেয়ে উচ্চারিত ধ্বনিগুলো কী?

ক. জিহ্বামূলীয় খ. দন্ত্য গ. কণ্ঠনালীয় ঘ. তালব্য

৩৭। জিহ্বামূলীয় ধ্বনি কোনটি?

ক. খ্ খ. ল্ গ. ট্ ঘ. থ্

৩৮। কণ্ঠনালীয় ধ্বনি কোনটি?

ক. খ্ খ. ল্ গ. হ্ ঘ. থ্

৩৯। যে-বাগ্‌যন্ত্র সচল তাকে বলে—

i. সচল বাকপ্রত্যঙ্গ

ii. সক্রিয় উচ্চারক

iii. নিষ্ক্রিয় বাকপ্রত্যঙ্গ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৪০। যে-বাকপ্রত্যঙ্গ স্থির তাকে বলে—

i. সক্রিয় বাকপ্রত্যঙ্গ

ii. নিষ্ক্রিয় উচ্চারক

iii. নিষ্ক্রিয় বাকপ্রত্যঙ্গ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪১। কোনটি সক্রিয় উচ্চারক?

ক. জিভের ডগা খ. দন্তমূল গ. কোমল তালু ঘ. উপরের ঠোঁট

৪২। কোনটি নিষ্ক্রিয় উচ্চারক?

ক. জিভের ডগা খ. কোমল তালু গ. কুঞ্চিত জিভের ডগা ঘ. স্বরতন্ত্র

৪৩। উচ্চারণরীতি অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে যা হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা হলো–

i. স্পৃষ্ট/স্পর্শ

ii. ঘর্ষণজাত, কম্পিত

iii. তাড়িত, পার্শ্বিক, নৈকট্যমূলক

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৪৪। মুখের মধ্যে ফুসফুস-আগত বাতাস প্রথমে কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ রুদ্ধ বা বন্ধ হয় এবং এরপর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে উচ্চারিত ধ্বনিগুলোকে কী বলে?

ক. নাসিক্য খ. স্পৃষ্ট গ. ঘর্ষণজাত ঘ. কম্পিত

৪৫। যেসব ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় বাতাস কেবল মুখ দিয়ে বের হয় সেগুলোকে কী ধ্বনি বলে?

ক. নাসিক্য খ. স্পৃষ্ট গ. ঘর্ষণজাত ঘ. কম্পিত

৪৬। ঘর্ষণজাত ধ্বনি আর কী ধ্বনি হিসেবে পরিচিত?

ক. নাসিক্য খ. স্পৃষ্ট গ. শিস ঘ. কম্পিত

৪৭। যে-ধ্বনি উচ্চারণকালে জিভ কম্পিত হয় তাকে কী ধ্বনি বলে?

ক. নাসিক্য খ. স্পৃষ্ট গ. শিস ঘ. কম্পিত

৪৮। যে-ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় জিভের সামনের অংশ উল্‌টে গিয়ে উপরের পাটি দাঁতের মূলে একটি মাত্র টোকা দেয়, তাকে বলে–

i. তাড়িত ধ্বনি

ii. টোকাজাত ধ্বনি

iii. পার্শ্বিক ধ্বনি

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৪৯। যে-ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস জিভের পেছনের এক পাশ বা দু-পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং জিভ দাঁত অথবা দন্তমূলে অবস্থান করে, তাকে কী ধ্বনি বলে?

ক. পার্শ্বিক খ. স্পৃষ্ট গ. শিস ঘ. কম্পিত

৫০। অন্তস্থ ব্‌ ও অন্তস্থ য়্‌ কোন জাতীয় ধ্বনি?

ক. পার্শ্বিক খ. নৈকট্যমূলক গ. শিস ঘ. কম্পিত

৫১। নৈকট্যমূলক ধ্বনির আরেক নাম কী?

ক. পার্শ্বিক ধ্বনি খ. তরল ধ্বনি গ. শিস ধ্বনি ঘ. কম্পিত ধ্বনি

৫২। স্বরযন্ত্রের ভেতরে কোন প্রত্যঙ্গ রয়েছে?

i. স্বররন্ধ্র

ii. স্বরতন্ত্র

iii. সরতন্ত্র

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i   খ. ii   গ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

৫৩। যে-ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে মুখ দিয়ে অধিক বাতাস বের হয় ও নিচের চোয়ালের মাংসপেশিতে বেশি চাপ পড়ে, সে ব্যঞ্জনগুলোকে বলে–

i. মহাপ্রাণ

ii. অল্পপ্রাণ

iii. স্বল্পপ্রাণ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i   খ. ii   গ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

৫৪। ঘর্ষণজাত ধ্বনি কোনটি?

ক. প্   খ. র্   গ. ঢ্   ঘ. শ্

৫৫। বাংলা ভাষায় মৌখিক স্বরধ্বনি কয়টি?

ক. ৬টি   খ. ৭টি   গ. ৮টি   ঘ. ৯টি

৫৬। বাংলা স্বরবর্ণ কটি?

ক. ৮টি   খ. ৯টি   গ. ১০টি   ঘ. ১১টি

৫৭। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?

ক. কার   খ. চিহ্ন   গ. ফলা   ঘ. প্রতীক

৫৮। বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি কটি?

ক. ৩৩টি   খ. ৩৫টি   গ. ৩৭টি   ঘ. ৩৯টি

৫৯। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কটি?

ক. ৩৭টি   খ. ৩৮টি   গ. ৩৯টি   ঘ. ৪০টি

৬০। যেগুলো স্বতন্ত্র বর্ণ নয় তা হলো–

i. বিসর্গ (ঃ)

ii. চন্দ্রবিন্দু (ँ)

iii. অনুস্বার (ং)

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i　খ. ii　গ. i ও ii　ঘ. i, ii ও iii

৬১। ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ণরূপ যে অবস্থানে থাকতে পারে তা হলো–

i. শব্দের শুরুতে

ii. শব্দের মাঝে

iii. শব্দের শেষে

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i　খ. ii　গ. i ও ii　ঘ. i, ii ও iii

৬২। ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?

ক. কার　খ. চিহ্ন　গ. ফলা　ঘ. প্রতীক

৬৩। একই ব্যঞ্জন পরপর দুবার ব্যবহৃত হলে তাকে কী বলে?

ক. দ্বিত্ব ব্যঞ্জন　খ. যুক্তব্যঞ্জন　গ. সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন　ঘ. স্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন

৬৪। ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ছাড়া সব ব্যঞ্জনসংযোগকে কী বলে?

ক. দ্বিত্ব ব্যঞ্জন　খ. যুক্তব্যঞ্জন　গ. সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন　ঘ. স্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন

৬৫। যুক্তব্যঞ্জন কত প্রকারের?

ক. ২　খ. ৩　গ. ৪　ঘ. ৫

৬৬। পূর্বের ও পরের ধ্বনির প্রভাবে ধ্বনির যে-পরিবর্তন তাকে কী বলে?

ক. ধ্বনি-পরিবর্তন　খ. প্রতিবেশ　গ. ধ্বনি-রূপান্তর　ঘ. ধ্বনিলোপ

৬৭। ধ্বনির পরিবর্তন বা মিলন যখন স্বরধ্বনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তাকে বলে–

i. স্বরসন্ধি

ii. ব্যঞ্জনসন্ধি

iii. বিসর্গ সন্ধি

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i　খ. ii　গ. i ও ii　ঘ. i, ii ও iii

৬৮। অ-ধ্বনির পর আ-ধ্বনি থাকলে উভয়ে মিলে কী হয়?

ক. ই　খ. উ　গ. আ　ঘ. ঈ

৬৯। ই-ধ্বনির পর ঈ-ধ্বনি থাকলে উভয়ে মিলে কী হয়?

ক. আ　খ. ই　গ. উ　ঘ. ঈ

৭০। অ বা আ-ধ্বনির পরে ই বা ঈ-ধ্বনি থাকলে উভয়ে মিলে কী হয়?

ক. এ   খ. ঈ   গ. উ   ঘ. আ

৭১। 'পরীক্ষা' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?

ক. পরি+ইক্ষা   খ. পরী+ইক্ষা   গ. পরি+ঈক্ষা   ঘ. পরী+ঈক্ষা

৭২। সন্ধির ফলে–

i. উচ্চারণে স্বাচ্ছন্দ্য আসে

ii. শ্রুতিমাধুর্য বাড়ে

iii. ভাষা সংক্ষিপ্ত হয়

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i   খ. ii   গ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

৩. রূপতত্ত্ব

শব্দের গঠন এবং একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্কের আলোচনা হলো রূপতত্ত্ব। একে শব্দতত্ত্ব-ও বলা হয়। এ-অধ্যায়ে শব্দ এবং শব্দের গঠনপদ্ধতি এবং শব্দসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হলো।

৩.১ শব্দ

দুই বা তার চেয়ে বেশি ধ্বনি মিলে শব্দ তৈরি হয়। যেমন– ম্ এবং আ মিলে হয় মা; আ+ম্+আ+র্= আমার। একটি ধ্বনি দিয়েও একটি শব্দ তৈরি হতে পারে। যেমন– ই, উ, আ। বেদনা, ক্ষোভ, দুঃখ ইত্যাদি ভাবপ্রকাশের জন্য আমরা এগুলো ব্যবহার করি। লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, এসবই হচ্ছে স্বরধ্বনি। অর্থাৎ একটি স্বরধ্বনি দিয়ে একটি শব্দ গঠিত হয়; কিন্তু কোনো একটি ব্যঞ্জনধ্বনির সাহায্যে শব্দ তৈরি হয় না।

৩.২ শব্দের গঠন

শব্দগঠনের জন্য কতকগুলো ভাষিক উপাদান রয়েছে। এগুলোকে বলে প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ ও সমাস। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো।

১) **প্রত্যয় :** প্রত্যয় বলতে সেইসব ভাষিক উপাদানকে বোঝায়, যেগুলো স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না। এগুলো শব্দের পরে বসে। প্রত্যয় দু ধরনের– কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়। **কৃৎ প্রত্যয়** বসে ক্রিয়ামূলের শেষে। যেমন– খেল্ + আ = খেলা; পড়্ + উয়া = পড়ুয়া। **তদ্ধিত প্রত্যয়** বসে শব্দের পরে। যেমন– সমাজ + ইক = সামাজিক; বাঙাল + ই = বাঙালি। প্রত্যয়ের সাহায্যে গঠিত কিছু শব্দের নমুনা নিচে দেওয়া হলো :

ক্রিয়ামূল / শব্দমূল + প্রত্যয় =	গঠিত শব্দ
ফল+ অন = ফলন	হাত+আ = হাতা
দুল্+অনা = দোলনা	ঢাকা+আই = ঢাকাই
কাঁদ্+অন = কাঁদন	প্যাঁচ+আনো = প্যাঁচানো
খেল্+অনা = খেলনা	পাগল+আমি = পাগলামি
ফুট্+অন্ত = ফুটন্ত	শাঁখা+আরি = শাঁখারি
বল্+আ = বলা	দাঁত+আল = দাঁতাল
বাঁধ্+আই = বাঁধাই	আকাশ+ই = আকাশি
জান্+আন = জানান	ইচ্ছা+উক = ইচ্ছুক
মিশ্+উক = মিশুক	জমি+দার = জমিদার
নাচ্+উনি = নাচুনি	হাত+উড়ে = হাতুড়ে

২) **বিভক্তি :** প্রত্যয়ের মতো বিভক্তিরও স্বাধীন ব্যবহার নেই। এগুলো ক্রিয়ামূল বা শব্দমূলের পরে বসে। ক্রিয়ামূলের পরে যে-বিভক্তি বসে তাকে বলে **ক্রিয়া-বিভক্তি**। যেমন– খেল্ + ই = খেলি; পড়্ + ইল = পড়িল>পড়ল; দেখ্ + ইব = দেখিব>দেখব। শব্দমূলের পরে যে-বিভক্তি বসে তা-ই শব্দ বিভক্তি। যেমন– বাড়ি + তে = বাড়িতে; মামা + র = মামার; ছাত্র + দের = ছাত্রদের।

৩) **উপসর্গ :** প্রত্যয় বা বিভক্তির মতো উপসর্গ বলতেও কিছু ভাষিক উপদানকে বোঝায়। কিন্তু প্রত্যয় ও বিভক্তি বসে শব্দের শেষে; উপসর্গ বসে শব্দের আগে। যেমন– 'হার' একটি শব্দ, এর পূর্বে প্র-, বি-, উপ- উপসর্গ যোগ করলে হয় প্রহার (< প্র + হার), বিহার (< বি + হার), উপহার (< উপ + হার)। বোঝাই যাচ্ছে যে, উপসর্গের সাহায্যে নতুন শব্দ বা ভিন্ন অর্থবহ শব্দ তৈরি হয়। কিন্তু বিভক্তির সাহায্যে তা কখনো হয় না, মূল শব্দটি কেবল সম্প্রসারিত হয়। প্রত্যয়যোগে নতুন শব্দ কখনো হয় আবার কখনো হয় না। মনে রাখতে হবে, নতুন শব্দ তখনই তৈরি হয় যখন আগের শব্দটি থেকে গঠিত শব্দটির অর্থ, আকার বা রূপ ও শ্রেণির পরিবর্তন ঘটে। যেমন– বাড়ি + তে = বাড়িতে শব্দে আয়তন 'বাড়ি' থেকে বেড়েছে, অর্থ বদলায়নি। কিন্তু 'পড়্'-এর পর -উয়া প্রত্যয় যোগ করে 'পড়ুয়া' গঠন করলে দেখা যাচ্ছে যে, 'পড়্' -এর অর্থ যা,'পড়ুয়া'-র অর্থ তা থেকে ভিন্ন। 'পড়্' (তুই বই পড়) হলো ক্রিয়া কিন্তু 'পড়ুয়া' বিশেষ্য।'পড়ুয়া' নতুন শব্দ।

৪) **সমাস :** দুই বা তার চেয়ে বেশি শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। যেমন– কালের অভাব = আকাল; খেয়া পারাপারের ঘাট = খেয়াঘাট; নদী মাতা যার = নদীমাতৃক ইত্যাদি।

৩.৩ শব্দের শ্রেণিবিভাগ বা সংবর্গ

শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তার নাম হয় পদ। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ বা পদকে সাধারণত আটটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো যথাক্রমে বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়াবিশেষণ অব্যয়, ক্রিয়া বিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক ও আবেগ। নিচে এগুলা আলোচনাচনা করা হলা

১) **বিশেষ্য :** যে-শব্দের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নামকে বোঝায় তা-ই **বিশেষ্য**। যেমন– মানুষ, বাঙালি, রাস্তা, উৎসব ইত্যাদি।

২) **সর্বনাম :** বিশেষ্যের পরিবর্তে যা ব্যবহৃত হয় তা-ই সর্বনাম। যেমন–

অনন্যা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে।

সে দুই কিলোমিটার হেঁটে স্কুলে আসে।

তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু পান্না।

তারা শিক্ষা সফরে গিয়েছিল।

উদাহরণে অনন্যার পরিবর্তে **'সে'**, **'তার'** ও **'তারা'** ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এজাতীয় সর্বনাম আরও রয়েছে। যেমন– আমি, আমরা, আমার, আমাদের, তুমি, তোমার, তোমাকে, আপনি, আপনার, আপনাকে, তুই, তোর, তোকে, তার, তাকে, তিনি, তাঁর, তাঁকে ইত্যাদি।

৩) **বিশেষণ :** যে-শব্দের মাধ্যমে বিশেষ্য বা সর্বনামের গুণ, অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তাকে বলে বিশেষণ। যেমন– **বিশাল** দিঘি; **উঁচু বাঁধানো** পুকুর; **হরেক রকম** গাছপালা, **ঘন** ঝোপ-জঙ্গলে আচ্ছন্ন পরিবেশ; **পাথর-বাঁধানো** ঘাট।

৪) **ক্রিয়া :** যে শব্দের দ্বারা কোনো কাজ করাকে বোঝায়, তাকে **ক্রিয়া** বলে। যেমন–

লিটন বই **পড়ে**।

সাকিব বল **খেলেছিল**।

কণা রবীন্দ্রসংগীত **শোনাবে**।

উপরের বাক্য তিনটিতে 'পড়ে', 'খেলেছিল', 'শোনাবে'– এ- তিনটি শব্দ কোনো-না-কোনো কাজ করাকে বোঝায়। ক্রিয়া প্রধানত দু প্রকার– (ক) সমাপিকা ক্রিয়া ও (খ) অসমাপিকা ক্রিয়া।

ক) **সমাপিকা ক্রিয়া :** যে-ক্রিয়া বাক্যের বা বক্তার মনোভাবের পূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি প্রকাশ করে, তাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যেমন– সে গান **গাইবে;** তুমি বিদ্যালয়ে **গিয়েছিলে;** আমি বই **পড়েছি**।

খ) **অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে-ক্রিয়া দ্বারা কাজের বা অর্থের অপূর্ণতা বা অসমাপ্তি বোঝায় তাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যেমন– আমার **যাওয়া** হবে না; আমি ভাত **খেয়ে** বাজারে যাব; আমাকে আমার মতো **চলতে** দাও।

৫) **ক্রিয়া বিশেষণ :** যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন :

ছেলেটি **ভালো** খেলে।
মেয়েটি **দ্রুত** হাটে।
লোকটি **শান্তভাবে** কাজ করে।

৬) **অনুসর্গ :** যেসব শব্দ কোনো শব্দের পরে বসে শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, সেসব শব্দকে অনুসর্গ বলে।

৭) **যোজক :** পদ ও বাক্যকে যেসব শব্দ যুক্ত করে, সেগুলোকে যোজক বলে। যেমন :
এবং, ও, আর, কিন্তু, তবু ইত্যাদি।

৮) **আবেগ :** যেসব শব্দ দিয়ে মনের বিচিত্র আবেগ বা অনুভূতিকে প্রকাশ করা হয়, সেগুলোকে আবেগ শব্দ বলে। যেমন : বাহ্, বেশ, শাবাস, ছি ছি ইত্যাদি।

৩.৪ শব্দের শ্রেণি- বা সংবর্গ পরিবর্তন

ক) **বিশেষ্য থেকে বিশেষণ :** বিশেষ্য শব্দের শেষে প্রত্যয় যোগ করে বিশেষণ শব্দ গঠন করা হয়। যেমন– বিশেষ্য : জল, বিশেষণ : জলা (জল+আ); ঢাকা ঢাকাই (ঢাকা+আই); দিন দৈনিক (দিন+ইক); নিচ নিচু (নিচ+উ); মাটি মেটে (মাটি+এ)।

খ) **বিশেষণ থেকে বিশেষ্য :** যে ভাষিক উপাদানের সাহায্যে বিশেষণ শব্দ তৈরি হয়েছে, সেই ভাষিক উপাদানটি বিচ্ছিন্ন করলেই বিশেষ্য শব্দ পাওয়া যায়। যেমন– মিঠাই (মিঠা+আই) মিঠা; চালাকি চালাক; নীলিমা নীল; লালিমা (লাল+ইমা) লাল।

৩.৫ লিঙ্গ

আমাদের ভাষায় এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলোর কোনোটি (ক) পুরুষবাচক, আবার কোনোটি (খ) নারীবাচক। আবার কোনো কোনো শব্দ পুরুষ বা নারীকে না বুঝিয়ে প্রাণহীন জিনিসকে বোঝায়। কোনো কোনো শব্দ আবার নারী ও পুরুষ উভয়কে বোঝাতে পারে। যেমন– চিকিৎসক, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, উপাচার্য ইত্যাদি।

ক) **পুরুষবাচক বিশেষ্য :** যে-শব্দ কেবল পুরুষকে নির্দেশ করে, তাকে **পুরুষবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন– কাকা, চাচা, দাদা, নানা, মামা, ভাই, স্বামী ইত্যাদি।

খ) **নারীবাচক শব্দ :** যে-শব্দে কেবল নারীকে নির্দেশ করে, তাকে **নারীবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন– মা, চাচি, কাকি, খালা, মামি, ভাবি, স্ত্রী, মাতা ইত্যাদি।

৩.৫.১ লিঙ্গ পরিবর্তন

ক) **পুরুষবাচক বিশেষ্য থেকে নারীবাচক বিশেষ্য :** আব্বা–আম্মা; চাচা–চাচি; মামা–মামি; ভাই–ভাবি; নানা–নানি; স্বামী–স্ত্রী। দাদা–বৌদি; দেওর–জা; পতি–পত্নী; শ্বশুর– শাশুড়ি; জেঠা–জেঠি; নায়ক–নায়িকা; বালক–বালিকা; ময়ূর–ময়ূরী; সিংহ–সিংহী; বর–বধূ।

৩.৬ বচন

বাংলা ভাষায় বিশেষ্য ও সর্বনামের সংখ্যাগত দু-ধরনের ধারণা পাওয়া যায়। যেমন–

বিশেষ্য	: একটির ধারণা	:	বল, মেয়ে, খাতা।
	একাধিকের ধারণা	:	বলগুলো, মেয়েরা, অনেক খাতা।
সর্বনাম	: একটির ধারণা	:	আমি, তুমি, সে।
	একাধিকের ধারণা	:	আমরা, তোমরা, তারা।

বিভিন্ন ভাষিক উপাদান বা **চিহ্ন** এর মাধ্যমে, কখনো কখনো শব্দ যোগ করে (**অনেক** লোক; **বহু** বছর আগে) কখনো আবার এক শব্দ পরপর দু-বার ব্যবহার করে (**হাজার হাজার** বছর আগে, **রাশি রাশি** ধান, **ঘড়া ঘড়া** চাল) বচনের পরিবর্তন করা হয়। নিচে বচনের চিহ্নসহ কিছু শব্দের এক বচন থেকে বহু বচনে রূপান্তর দেখানো হলো।

	একবচন	বহুবচন
-রা	: ছেলে	ছেলেরা
-এরা	: ভাই	ভাইয়েরা
-গুলো	: বই	বইগুলো
-গুলো	: আম	আমগুলো
-গণ	: শিক্ষক	শিক্ষকগণ
-বৃন্দ	: ছাত্র	ছাত্রবৃন্দ
-মালা	: মেঘ	মেঘমালা।

৩.৭ পক্ষ বা পুরুষ

পড়া শেষ করে **আমি** বল খেলতে যাব। **আমরা** পনেরো জন মিলে একটি দল করেছি। বিপক্ষ দলে যারা খেলে, **তারা আমাদের** চেয়ে দুর্বল নয়। **আমার** বন্ধু রাফিকে বললাম, "**তুমি ওদের** ভয় পেয়ো না। **ওরা** যত শক্তিশালীই হোক, **আমাদের** মনোবল থাকলে **আমরা** জিতবই। শিমুল **ওদের** দলনেতা। **তোমরা** সাহসের সঙ্গে খেলবে।" রাফি আমাকে সমর্থন করে আরও সাহসী হতে বলল।

উপরের অনুচ্ছেদে তিন ধরনের ব্যক্তি রয়েছে। ব্যাকরণে এদের পক্ষ বা পুরুষ বলে। এই পক্ষ একজন বা একাধিক হতে পারে। অনুচ্ছেদে মোটা হরফে লেখা শব্দগুলো তিন ধরনের পক্ষ নির্দেশ করে। যেমন–

বক্তাপক্ষ	: বক্তা নিজে ও তার বন্ধুরা	: আমি, আমরা, আমাদের, আমার।
শ্রোতাপক্ষ	: শ্রোতা ও তার বন্ধুরা	: তুমি, তোমরা।
অন্যপক্ষ	: অন্য ব্যক্তি ও তার বন্ধুরা	: ও, ওরা, ওদের।

বাক্যের সঙ্গে জড়িত এই তিন ধরনের ব্যক্তিকে **পক্ষ** বা **পুরুষ** বলে। পক্ষ তিন প্রকার– (ক) বক্তাপক্ষ, (খ) শ্রোতাপক্ষ ও (গ) অন্যপক্ষ।

ক) **বক্তাপক্ষ :** যে-সর্বনামের দ্বারা বাক্যের বা উক্তির বক্তা নিজেকে বা বক্তার দলের সবাইকে বোঝায়, তাকে **বক্তাপক্ষ বা উত্তম পুরুষ** বলে। যেমন– আমি, আমাকে, আমার, আমরা, আমাদের।

খ) **শ্রোতাপক্ষ :** যে-সর্বনামের দ্বারা শ্রোতা বা শ্রোতার দলের সবাইকে বোঝায়, তাকে শ্রোতাপক্ষ বা মধ্যম পুরুষ বলে। যেমন– তুমি, তোমাকে, তোমার, তোমরা, তোমাদের, আপনি, আপনারা, আপনাকে, আপনার, আপনাদের, তুই, তোরা, তোকে, তোর, তোদের।

গ) **অন্যপক্ষ :** যে-সর্বনামের দ্বারা বক্তা বা শ্রোতা ছাড়া অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বোঝায়, তাকে অন্য পক্ষ বা প্রথম পুরুষ বা নাম-পুরুষ বলে। যেমন–

সর্বনাম পদ : সে, তাকে, তার, এ, একে, এর, তারা, তাদের।

বিশেষ্য পদ : অপু, অপুকে, অপুর অর্থাৎ যেকোনো নাম।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

ঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও :

১। শব্দের গঠন এবং একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্কের আলোচনা ব্যাকরণের কোন অংশে হয়?

ক. ধ্বনিতত্ত্বে খ. রূপতত্ত্বে গ. বাক্যতত্ত্বে ঘ. বাগর্থতত্ত্বে

২। শব্দগঠনের জন্য ভাষিক উপাদান হলো–

i. প্রত্যয়

ii. বিভক্তি

iii. উপসর্গ ও সমাস

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. i ও ii　　ঘ. i, ii ও iii

৩। প্রত্যয় শব্দের কোথায় বসে?

ক. পরে　　খ. পূর্বে　　গ. মাঝে　　ঘ. সঙ্গে

৪। স্বাধীন ব্যবহার নেই যাদের–

i. প্রত্যয়

ii. বিভক্তি

iii. উপসর্গ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. i ও ii　　ঘ. i, ii ও iii

৫। বিভক্তির নেই–

i. অর্থ

ii. স্বাধীন ব্যবহার

iii. শব্দগঠনের ক্ষমতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. i ও ii　　ঘ. i, ii ও iii

৬। শব্দের পরে যে-বিভক্তি বসে তাকে কী বলে?

ক. নামবিভক্তি　　খ. পদবিভক্তি　　গ. শব্দবিভক্তি　　ঘ. ক্রিয়াবিভক্তি

৭। দুই বা তার চেয়ে বেশি শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াকে কী বলে?

ক. বিভক্তি　　খ. উপসর্গ　　গ. সন্ধি　　ঘ. সমাস

৮। শব্দ কত প্রকার?

ক. ৩　　খ. ৪　　গ. ৫　　ঘ. ৬

৯। কোনো শব্দের মাধ্যমে যা বোঝালে তাকে বিশেষ্য বলে, তা হলো–

i. ব্যক্তি, জাতির নাম

ii. সমষ্টি, বস্তু, স্থানের নাম

iii. কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

১০। বিশেষ্যের পরিবর্তে যা ব্যবহৃত হয় তাকে কী বলে?

ক. বিশেষণ খ. সর্বনাম গ. ক্রিয়া ঘ. অব্যয়

১১। বিশেষণ প্রকাশ করে–

i. বিশেষ্য বা সর্বনামের গুণ

ii. বিশেষ্য বা সর্বনামের গুণ, অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য

iii. ক্রিয়ার ভাব

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

১২। যে-শব্দের দ্বারা কোনো কাজ করাকে বোঝায় তাকে বলে–

i. বিশেষ্য

ii. বিশেষণ

iii. ক্রিয়া

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

১৩। ক্রিয়া প্রধানত কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

১৪। যে-ক্রিয়া বাক্যের বা বক্তার মনোভাবের পূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি প্রকাশ, করে তাকে কী বলে?

ক. বিশেষ্য খ. সমাপিকা ক্রিয়া গ. অসমাপিকা ক্রিয়া ঘ. ক্রিয়া

১৫। যে-ক্রিয়া দ্বারা কাজের বা অর্থের অপূর্ণতা বা অসমাপ্তি বোঝায়, তাকে কী বলে?

ক. বিশেষ্য খ. সমাপিকা ক্রিয়া গ. অসমাপিকা ক্রিয়া ঘ. ক্রিয়া

১৬। বিশেষ্য শব্দের শেষে কী যোগ করে বিশেষণ শব্দ গঠন করা হয়?

ক. উপসর্গ খ. অনুসর্গ গ. বিভক্তি ঘ. প্রত্যয়

১৭। কোন শব্দ দ্বারা নারী ও পুরুষ উভয়কে বোঝায়?

ক. দাদা　　খ. মামা　　গ. উপাচার্য　　ঘ. খালা

১৮। বাংলা ভাষায় বিশেষ্য ও সর্বনামের সংখ্যাগত কত ধরনের ধারণা পাওয়া যায়?

ক. ২　　খ. ৩　　গ. ৪　　ঘ. ৫

১৯। পক্ষ বা পুরুষ কত প্রকার?

ক. ২　　খ. ৩　　গ. ৪　　ঘ. ৫

২০। যে সর্বনামের দ্বারা বাক্যের বা উক্তির বক্তা নিজেকে বা বক্তার দলের সবাইকে বোঝায়, তাকে বলে–

i. বক্তাপক্ষ

ii. শ্রোতাপক্ষ

iii. অন্যপক্ষ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

২১। যে সর্বনামের দ্বারা বক্তা বা শ্রোতা ছাড়া অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বোঝায়, তাকে বলে–

i. বক্তাপক্ষ

ii. শ্রোতাপক্ষ

iii. অন্যপক্ষ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

২২। শ্রোতাপক্ষ কোনটি?

ক. আমি　　খ. তুমি　　গ. সে　　ঘ. তারা

২৩। 'ইচ্ছুক'-শব্দটিতে কোন প্রত্যয়টি যুক্ত হয়েছে?

ক. -অক　　খ. -ইক　　গ. -উক　　ঘ. -আক

২৪। নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়েছে?

ক. আকাশ　　খ. আহার　　গ. বিকল　　ঘ. হাতল

৪. বাক্যতত্ত্ব

ধ্বনি দিয়ে আমরা যে-আলোচনা শুরু করেছিলাম, শব্দে এসে তা নির্দিষ্ট কাঠামো লাভ করেছে। শব্দ থেকে বৃহৎ একক হলো বাক্য। আমরা যে-শব্দই শিখি না কেন, লক্ষ্য থাকে তাকে বাক্যে প্রয়োগ করার। যেমন– **পড়া** একটি শব্দ। শব্দটি বাক্যে প্রয়োগ করতে হলে আমাদের তা এভাবে প্রয়োগ করতে পারি :

> **আমি পড়ালেখায়** আনন্দ পাই। একজাতীয় বই সবসময় **পড়তে** ভালো লাগে না। ছেলেমেয়েদের **পড়ার** সঙ্গে লেখার অভ্যাস করা দরকার।

বাক্য এবং বাক্যের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সম্পর্কই বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।

৪.১ বাক্যের পরিচয়

আমরা বাক্য তৈরি করি এক বা একাধিক শব্দ একত্রে সাজিয়ে। যেমন– 'আমি বাড়ি গিয়ে ভাত খাব।' মনে রাখতে হবে, শব্দ যখন বাক্যে স্থান পায়, তখন তার পরিচয় হয় ভিন্ন। বাক্যের শব্দকে বলে **পদ**। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগ করলেই পদ তৈরি হয়। সে-হিসেবে পদ তৈরির সূত্র হলো : শব্দ + বিভক্তি = পদ। যেমন– 'আমি বই পড়ি', এ-বাক্যে তিনটি পদ আছে। 'আমি', 'বই' ও 'পড়ি'। এখানে 'পড়ি' পদটি তৈরি হয়েছে পড়্ -এর সঙ্গে ই বিভক্তি দিয়ে। কিন্তু 'আমি' ও 'বই' শব্দে কোনো বিভক্তি দেখা যাচ্ছে না। যেখানে বিভক্তি দেখা যায় না, সেখানে একটি শূন্য বিভক্তি কল্পনা করতে হবে। 'আমি' ও 'বই' পদ তৈরি হয়েছে আমি + শূন্য এবং বই + শূন্য বিভক্তি দিয়ে।

৪.২ বাক্যগঠন

বিভিন্ন পদের সাহায্যে বাক্য গঠিত হয়। কিন্তু পদগুলো পরপর সাজালেই বাক্য হবে না। যেমন– **বসেছিলাম সকালে পাশে রাস্তার আমি**। এ-বাক্যে পাঁচটি পদ আছে, কিন্তু বাক্য হয়নি। কারণ পদগুলোর সাহায্যে কোনো অর্থ বোঝাচ্ছে না। বাক্যের পদগুলো ঠিকমতো পরপর বসালেই চেহারা বদলে যাবে, বাক্যটি অর্থপূর্ণ হবে। যেমন– **আমি সকালে রাস্তার পাশে বসেছিলাম**। পদগুলোকে এই যে সাজানো হলো তার একটি নিয়ম আছে। সব ভাষায় তা এক রকম হয় না। ইংরেজরা বলে : আমি খাই ভাত (I eat rice); কিন্তু বাংলায় আগে 'ভাত' আসে, তারপর আমরা 'খাই', বলি : **আমি ভাত খাই**। এ-বাক্যেই পদ সাজানোর নিয়মটি লুকিয়ে আছে। কে খাবে– আমি; কী খাবে– ভাত, খাওয়া হলো মূল কাজ। যে কাজ করে তাকে বলে **কর্তা**, কাজটি হলো **কর্ম** আর **ক্রিয়া** তো আছেই 'খাওয়া'। এখন সূত্রের আকারে বলা যায় : বাংলা বাক্যের গঠন হলো **কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া** (Subject + Object + Verb), সংক্ষেপে SOV। কখনো-কখনো বাক্যের এই গঠনসূত্র মানা হয় না। কিন্তু সাধারণভাবে তা অনুসরণ করতে হবে।

৪.৩ বাক্যের ভাবগত শ্রেণিবিভাগ

ভাবগত দিক থেকে বাক্যকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়– (১) বিবৃতিমূলক, (২) জিজ্ঞাসাবোধক, (৩) বিস্ময়বোধক ও (৪) অনুজ্ঞাবাচক।

১) **বিবৃতিমূলক বাক্য :** যে-বাক্যে কোনো কিছু বিবৃত করা হয়, তাকে **বিবৃতিমূলক বাক্য** বলে। যেমন– রাস্তা বড় বিপদসংকুল। সকালে আমরা শহর দেখতে বের হলাম। আকাশ বর্ণহীন গ্যাসে ভরা। বিবৃতিমূলক বাক্য আবার দু-প্রকার– (ক) হাঁ-বোধক বাক্য ও (খ) না-বোধক বাক্য।

ক) **হাঁ-বোধক বাক্য :** যে-বাক্য দ্বারা হাঁ-সূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে **হাঁ-বোধক বাক্য** বলে। যেমন– সোমা বই পড়ে। রাহাত ফুটবল খেলে। সানজিদা গান গায়।

খ) **না-বোধক বাক্য :** যে-বাক্য দ্বারা না-সূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে **না-বোধক বাক্য** বলে। যেমন– টুম্পা সিনেমা দেখবে না। আমরা আজ মাঠে যাইনি। এ-গ্রামে একজন ডাক্তারও নেই।

২. **জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য :** সংবাদ পাওয়ার জন্য শ্রোতাকে লক্ষ্য করে যে-বাক্য বলা হয়, তাকে **জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য** বা **প্রশ্নবাক্য** বলে। যেমন– আজ কি তোমার স্কুল খোলা? আপনি চা খাবেন কি? তুমি কী ভাবছ?

৩. **বিস্ময়বোধক বাক্য :** এ-ধরনের বাক্যে বিস্ময়, উচ্ছ্বাস ইত্যাদি আকস্মিক ও প্রবল আবেগ প্রকাশ পায়। যেমন– বাপ রে! কী প্রচণ্ড গরম! লোকটার কী সাহস!

৪. **অনুজ্ঞাবাচক বাক্য :** যে-ধরনের বাক্যে অনুরোধ, আদেশ, প্রার্থনা, আশীর্বাদ, মিনতি ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তাকে **অনুজ্ঞাবাচক বাক্য** বা **অনুজ্ঞা বাক্য** বলে। যেমন– বইটি আমাকে পড়তে দাও না! তুমি ক্লাসে কথা বলবে না। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। কাল আসতে ভুল করবে না কিন্তু!

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

ঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও :

১। যে কাজ করে তাকে কী বলে?

ক. কর্ম　　খ. কর্তা　　গ. ক্রিয়া　　ঘ. উদ্দেশ্য

২। বাংলা বাক্যের গঠনপ্রক্রিয়া হলো–

i. কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া

ii. কর্ম + কর্তা + ক্রিয়া

iii. কর্তা + ক্রিয়া + কর্ম

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. i ও ii　　ঘ. i, ii ও iii

৩। ভাবগত দিক থেকে বাক্য কত প্রকার?

ক. ৩　　খ. ৪　　গ. ৫　　ঘ. ৬

৪। যে-বাক্যে কোনোকিছু বিবৃত করা হয় তাকে কী বলে?

ক. বিস্ময়বোধক বাক্য খ. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য গ. হাঁ-বোধক বাক্য ঘ. বিবৃতিমূলক বাক্য

৫। বিবৃতিমূলক বাক্য কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

৬। সংবাদ পাওয়ার জন্য শ্রোতাকে লক্ষ্য করে যে-বাক্য বলা হয়, তাকে কী বলে?

ক. বিস্ময়বোধক বাক্য খ. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য গ. জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য ঘ. বিবৃতিমূলক বাক্য

৭। যে-ধরনের বাক্যে বিস্ময়, উচ্ছ্বাস ইত্যাদি আকস্মিক ও প্রবল আবেগ প্রকাশ পায়, তাকে কী বলে?

ক. বিস্ময়বোধক বাক্য খ. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য গ. জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য ঘ. বিবৃতিমূলক বাক্য

৮। যে-ধরনের বাক্যে অনুরোধ, আদেশ, প্রার্থনা, আশীর্বাদ, মিনতি ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তাকে কী বলে?

ক. বিস্ময়বোধক বাক্য খ. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য গ. জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য ঘ. বিবৃতিমূলক বাক্য

৯। 'পিউ সিনেমা দেখতে পছন্দ করে না।'– এটি কোন ধরনের বাক্য?

ক. বিস্ময়বোধক বাক্য খ. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য গ. জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য ঘ. বিবৃতিমূলক বাক্য

১০। 'সৃষ্টিকর্তা তোমার মঙ্গল করুন।'– এটি কোন ধরনের বাক্য?

ক. বিস্ময়বোধক বাক্য খ. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য গ. জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য ঘ. বিবৃতিমূলক বাক্য

৫. বাগর্থ

শব্দ ও বাক্যের অর্থের আলোচনা হলো বাগর্থ। অভিধানে প্রতিটি শব্দের অর্থ থাকে। কিন্তু সেই অর্থের বাইরে নানা অর্থে শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাগর্থতত্ত্বে এসব দিক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে আরও সহজে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। যেমন– 'বাবা' একটি শব্দ। এর অর্থ হলো আব্বা বা পিতা। বাবার সঙ্গে আরও দুটি অর্থ জড়িয়ে আছে : 'পূর্ণবয়স্ক' ও 'পুরুষ'। যদি বলি 'সাঁইবাবা', 'সাধুবাবা' তখন আর এ-বাবা পিতা নয়, অন্যকিছু, হয়তো গুরু, নাহয় কোনো সজ্জন, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। এ থেকে বোঝা যায়, শব্দের অর্থের নির্দিষ্ট প্রতিবেশ বা ব্যবহারের ক্ষেত্র আছে। এর বাইরে শব্দের কোনো অর্থ নেই। এ-অধ্যায়ে শব্দের অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৫.১. সমশব্দ

দুটি শব্দ যখন ধ্বনিগত দিক থেকে একই রকম শোনায় কিন্তু অর্থের দিকে থেকে ভিন্ন হয় তখন এসব শব্দকে সমশব্দ বলে। এগুলোকে সমোচ্চারিত শব্দও বলা হয়। যেমন– কুল (ফলবিশেষ), কূল (নদীর পাড় বা কিনার), কৃতি (কাজ), কৃতী (সফল) ইত্যাদি।

৫.২ সমার্থশব্দ

যে-সকল শব্দ সমান বা একই অর্থ প্রকাশ করে তাকে **সমার্থশব্দ** বলে। যেমন– জননী, মাতা, প্রসূতি, গর্ভধারিণী– এই শব্দগুলোর অর্থ একই। অর্থাৎ এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলোর বানান ও উচ্চারণ আলাদা, কিন্তু অর্থ এক। এজাতীয় শব্দগুলোকে বলে সমার্থশব্দ। সমার্থশব্দকে প্রতিশব্দও বলা হয়। নিচে কিছু শব্দ এবং সেগুলোর সমার্থশব্দ উল্লেখ করা হলো।

শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিষয়ক সমার্থশব্দ :

১. কপাল : ভাল, ললাট।

২. কান : কর্ণ, শ্রুতিপথ, শ্রবণেন্দ্রিয়।

৩. গলা : কণ্ঠ, গলদেশ, গ্রীবা।

৪. গাল : কপোল, গণ্ডদেশ।

৫. চুল : অলক, কুন্তল, কেশ।

৬. চোখ : অক্ষি, আঁখি, নয়ন, নেত্র, লোচন।

৭. নাক : ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসা, নাসিকা।

৮. পা : চরণ, পদ, পাদ।

৯. পেট : উদর, জঠর।

১০. বুক : উদর, বক্ষ, সিনা।

১১. মাথা : উত্তমাঙ্গ, মস্তক, মুণ্ড, শির।

১২. মুখ : আনন, বদন।

১৩. হাত : কর, পাণি, বাহু, ভুজ, হস্ত।

প্রাকৃতিক বস্তু-বিষয়ক সমার্থশব্দ :

১. আকাশ : অম্বর, গগন, নভঃ, ব্যোম, শূন্য।

২. গাছ : তরু, দ্রুম, পাদপ, বিটপী, বৃক্ষ।

৩. জল : নীর, পানীয়, বারি, সলিল।

৪. পাহাড় : অচল, অদ্রি, গিরি, পর্বত, ভূধর।

৫. মেঘ : অম্বুদ, জলদ, জলধর, বারিদ।

৫.৩ বিপরীতার্থক শব্দ

যখন কোনো শব্দ আরেকটি শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তখন শব্দ দুটিকে একে অন্যের বিপরীতার্থক শব্দ বলে। ভাষায় অনেক শব্দ আছে, যেমন– কম-বেশি, অল্প-অধিক। কিছু শব্দ বিভিন্ন ভাষিক উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে। এগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ সেভাবেই গঠিত হয়েছে। যেমন– আস্তিক-নাস্তিক, পাপিনী-নিষ্পাপা, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি। নিচে আরও উদাহরণ দেওয়া হলো :

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অতীত	বর্তমান	বড়	ছোট
আকাশ	পাতাল	ভালো	মন্দ
আনন্দ	নিরানন্দ	রাত	দিন
আলো	আঁধার	শত্রু	মিত্র
আসল	নকল	সকাল	বিকাল
উন্নতি	অবনতি	সৎ	অসৎ
উপকার	অপকার	সুখ	দুঃখ
কাঁচা	পাকা	কুৎসিত	সুন্দর
গ্রহণ	বর্জন	ধ্বংস	সৃষ্টি
জয়	পরাজয়	স্বাধীন	পরাধীন
নরম	কঠিন	জিৎ	হার
পাপ	পুণ্য	হাসি	কান্না।

৫.৪ রূপক

অভিধানে শব্দের একটি অর্থ থাকে কিন্তু ব্যবহারের সময় দেখা যায়, তা সে অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে না। যেমন– 'পতন' একটি শব্দ। আভিধানে এর অর্থ দেওয়া আছে : 'পড়া, উপর থেকে নিচে চ্যুতি।' কিন্তু আমরা যখন বলি : উনসত্তরের গণআন্দোলনে পাকিস্তানি একনায়ক আইউব খানের পতন হয়'– তখন এ 'পতন' উপর থেকে নিচে পড়া নয়। এর অর্থ 'শেষ হওয়া', 'সমাপ্ত হওয়া'। এভাবে শব্দ যখন অভিধান-অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করে তখন তা রূপক হয়। যেমন– 'আমি **কান** পেতে রই।' বাক্যটিতে 'কান' কর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি, এখানে এটি মনোযোগ, অভিনিবেশ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথের একটি গান দেখো :

"আমরা সবাই **রাজা** আমাদের এই **রাজা**র রাজত্বে
নইলে মোদের **রাজা**র সনে মিলব কী স্বত্বে।–
আমরা সবাই **রাজা**।
আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের **রাজা**র ত্রাসের দাসত্বে,
নইলে মোদের **রাজা**র সনে মিলব কী স্বত্বে–
আমরা সবাই **রাজা**।"

গানটিতে 'রাজা' শব্দটি সাতবার ব্যবহার করা হয়েছে। এ-রাজা সম্রাট, বাদশাহ বা নৃপতি নয়। যারা গানটি গাইছে, এখানে তাদের মনের ইচ্ছাকে বড় করে দেখা হয়েছে। রাজাকে কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না। গায়কেরাও স্বাধীন, তারা মনের খুশিতেই চলতে চায়। এভাবে কবিতা, গান কিংবা অন্য কোনো রচনায় একই শব্দ বারবার ব্যবহার করা হলে তা রূপক হয়।

৫.৫ দ্বিরুক্ত শব্দ

একটি শব্দ একবার উচ্চারিত হলে শব্দটি যে-অর্থ প্রকাশ করে তা দুবার উচ্চারণ করলে সে-অর্থ পরিবর্তিত হয়। যেমন– আমার **জ্বর** হয়েছে । এখানে 'জ্বর'-এর যে-অর্থ প্রকাশ পায়, 'আমার **জ্বর জ্বর** লাগছে' বললে অন্য অর্থ বোঝায়। 'জ্বর জ্বর' অর্থ ঠিক জ্বর নয়, জ্বরের মতো খারাপ লাগা। নিচে উদাহরণের সাহায্যে অর্থসহ কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ দেওয়া হলো :

বহুত্ববাচক	: গাড়ি গাড়ি, হাঁড়ি হাঁড়ি, সাদা সাদা।
সাদৃশ্যবাচক	: নিবুনিবু, পড়োপড়ো, কাঠ কাঠ।
সংযোগ	: চোখে-চোখে, পিঠে-পিঠে, হাতে-হাতে।
ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা	: যেতে যেতে, বলতে বলতে।
প্রকার বোঝাতে	: হাসিহাসি, ভালোয় ভালোয়।
পরস্পর সম্পর্ক বোঝাতে	: গলাগলি, মুখোমুখি, খোলাখুলি।

প্রকর্ষ অর্থে	: চ্যাঁচামেচি, ধরাধরি, হাঁকাহাঁকি।
ইত্যাদি অর্থে	: কাপড়চোপড়, জলটল।
আবেগ বোঝাতে	: ধিক্ ধিক্, ছি ছি, হাঁ হাঁ।
অনুকরণ অর্থে	: চোর চোর, ঘোড়া ঘোড়া।

৫.৬ পারিভাষিক শব্দ

বিশেষ অর্থ বহন করে এমন শব্দগুলো হলো পারিভাষিক শব্দ। জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় এমন কিছু শব্দ পাই যেগুলোর সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। এগুলোর বাংলা সমার্থশব্দ অনেক সময় পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় তৈরি করতে হয় পারিভাষিক শব্দ। পরিভাষা তৈরির একটি নীতি হচ্ছে **উৎস** ও **লক্ষ্য** -এর মধ্যে এক-এক সম্পর্ক রক্ষা। যেমন– ইংরেজি ভাষায় বলে Aeroplane. আমরা এর বাংলা পরিভাষা করেছি 'বিমান'। এখানে অ্যারোপ্লেন হলো উৎস আর বিমান হলো লক্ষ্য। অ্যারোপ্লেনের সঙ্গে বাতাস ও ওড়ার সম্পর্ক আছে। কিন্তু বিমান-এর সঙ্গে এসবের তেমন যোগ নেই। পরিভাষা তৈরিতে উৎস ও লক্ষ্যের মধ্যে অর্থগত ঐক্য থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। অ্যারোপ্লেন বললে সব সময় 'বিমান' বুঝতে হবে। এটিই হলো এক-এক সম্পর্ক। সবচেয়ে বড় কথা, পরিভাষা নির্বাচন করতে হবে লোকজজীবনের গভীর থেকে। উদাহরণ দেওয়া যাক। ইংরেজি ভাষায় আছে Fish Landing Centre. কিন্তু আমাদের মাছেরা অবতরণ করে না। জেলেরা মাছ ধরে আড়তে আনে। সেখান থেকেই মাছ কেনা-বেচা হয়। আমাদের সবাই আড়ত বোঝে। তাই ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার-এর বাংলা পরিভাষা হলো 'মাছের আড়ত'। নিচে উৎসসহ কিছু পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করা হলো।

Adviser	উপদেষ্টা	Debate	বিতর্ক
Affidavit	হলফনামা	Democracy	গণতন্ত্র
Agent	প্রতিনিধি	Design	নকশা
Agenda	কৃত্যসূচি	Designation	পদমর্যাদা
Air	আকাশ	Diplomat	কূটনীতিক
Airport	বিমানবন্দর	Director	পরিচালক
Allowance	ভাতা	Donor	দাতা
Analysis	বিশ্লেষণ	Duplicate	অনুলিপি

৫.৭ বাগ্‌ধারা

বাগ্‌ধারাগুলো এক দিনে সৃষ্টি হয়নি। বহু মানুষের বহু যুগের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এগুলোর মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। শব্দের অতিপরিচিত যে-অর্থ, বাগ্‌ধারার অর্থ তা থেকে স্বতন্ত্র। অভিধানে বাগ্‌ধারাগুলোকে পৃথকভাবে ভুক্তি দিয়ে এগুলোর অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– 'কাঁঠাল' বললে আমরা সবাই জানি তা এক ধরনের ফল, বাংলাদেশের জাতীয় ফল। কিন্তু বাগ্‌ধারায় যখন বলা হয় 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব', তখন কাঁঠাল কিংবা আমসত্ত্বের অর্থ খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হবে। পুরো বাগ্‌ধারাটি একটি শব্দ বা ভাষিক উপাদান এবং

এর অর্থও স্বতন্ত্র, তা হলো 'অসম্ভব বস্তু'। অনুরূপ : হাড়জুড়ানো; মাথা খাওয়া; মুখ করা; আঠারো মাসে বছর, ভুঁইফোঁড় ইত্যাদি বাগধারার উদাহরণ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও :

১। বাগর্থে যে বিষয়ের আলোচনা হয় তা হলো–

i. ধ্বনির অর্থের

ii. শব্দের অর্থের

iii. বাক্যের অর্থের

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

২। দুটি শব্দ যখন ধ্বনিগত দিক থেকে একই রকম শোনায় কিন্তু অর্থের দিক থেকে ভিন্ন হয়, তখন একে কী বলে?

ক. সমশব্দ খ. সমার্থশব্দ গ. বিকল্প শব্দ ঘ. রূপক

৩। সমশব্দের অপর নাম কী?

ক. বিকল্প শব্দ খ. সমার্থশব্দ গ. সমোচ্চারিত শব্দ ঘ. রূপক

৪। যেসকল শব্দ সমান বা একই অর্থ প্রকাশ করে তাকে কী বলে?

ক. বিকল্প শব্দ খ. সমার্থশব্দ গ. সমোচ্চারিত শব্দ ঘ. রূপক

৫। সমার্থশব্দের অপর নাম কী?

ক. বিকল্প শব্দ খ. সমশব্দ গ. সমোচ্চারিত শব্দ ঘ. প্রতিশব্দ

৬। যখন কোনো শব্দ আরেকটি শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তখন শব্দ দুটিকে একে অন্যের কী শব্দ বলে?

ক. বিকল্প শব্দ খ. বিপরীত শব্দ গ. সমোচ্চারিত শব্দ ঘ. প্রতিশব্দ

৭। শব্দ যখন অভিধান-অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে কী বলে?

ক. বিকল্প শব্দ খ. সমার্থশব্দ গ. সমোচ্চারিত শব্দ ঘ. রূপক

৮। একটি শব্দ পরপর দুবার ব্যবহার করলে তাকে কী বলে?

ক. দ্বিরুক্ত শব্দ খ. সমশব্দ গ. সমোচ্চারিত শব্দ ঘ. প্রতিশব্দ

৯। বিশেষ অর্থ বহন করে এমন শব্দকে কী বলে?

ক. দ্বিরুক্ত শব্দ খ. সমশব্দ গ. পারিভাষিক শব্দ ঘ. প্রতিশব্দ

১০। 'কুল'-এর সমশব্দ কী?

ক. কল খ. কাল গ. বরই ঘ. কূল

১১। 'চোখ'-এর সমার্থশব্দ কোনটি নয়?

ক. আঁখি খ. নেত্র গ. লোচন ঘ. লেচন

১২। ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা বোঝাতে দ্বিরুক্ত শব্দ কোনটি?

ক. ভালোয় ভালোয় খ. যেতে যেতে গ. হাতে-হাতে ঘ. হাঁকাহাঁকি

১৩। 'আকাশ'-এর প্রতিশব্দ কোনটি?

ক. পৃথিবী খ. গগন গ. বিশ্ব ঘ. অবনি

১৪। কোনটি 'পাহাড়' শব্দের সমার্থশব্দ নয়?

ক. পর্বত খ. শৈল গ. গিরি ঘ. ধরণী

১৫। 'সুন্দর'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

ক. জিৎ খ. কুৎসিত গ. কদাকার ঘ. কোনোটি নয়

১৬। 'কাঁচা' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?

ক. গুণ খ. পুণ্য গ. পাকা ঘ. অপরিপক্ব

৬. বানান

বানান বলতে বোঝায় 'বর্ণন' বা বর্ণনা করা। অন্যভাবে বলা যায়, বানান হলো বুঝিয়ে বলা। লিখিত ভাষায় এই বলা দ্বারা স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণের পর ব্যঞ্জনবর্ণ অথবা স্বরবর্ণের পর ব্যঞ্জনবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের পর স্বরবর্ণ যোগ করাকে বোঝায়। যেমন– স্বরবর্ণ + ব্যঞ্জনবর্ণ : আম; ব্যঞ্জনবর্ণ + স্বরবর্ণ : মা (ম্ + আ); ব্যঞ্জনবর্ণ + স্বরবর্ণ + ব্যঞ্জনবর্ণ + ব্যঞ্জনবর্ণ : কষ্ট (ক্+অ+ষ্+ট)।

বানান শিখতে বা লিখতে গেলে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পরিপূর্ণভাবে ধ্বনি অনুযায়ী বানান লেখার নিয়ম বিশ্বের কোনো ভাষায় নেই। ধ্বনিতত্ত্ব অংশে আমরা দেখেছি যে, আমাদের ভাষায় সব বর্ণ সব ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে না। কিন্তু সব বর্ণই আমাদের লিখনপদ্ধতির আশ্রয়। আমাদের জানতে হবে কোথায় দীর্ঘস্বর (ঈ, ঊ), চন্দ্রবিন্দু (ঁ), কোথায় ন্, কোথায় ণ্, কোথায় শ্ স্ ষ্, কোথায় বিসর্গ (ঃ), কোথায় ঙ, ঞ, ং, ক্ষ, ঞ্জ, ঙ্গ, ঙ্ক, ত, ৎ, ক্ষ্ম ইত্যাদি বসবে। এসবের ব্যবহার না জানলে বানান ভুল হবে।

৬.১ বানানের ধারণা

এমন এক সময় ছিল যখন বাংলা বানানের নিয়মের প্রতি কারো আগ্রহ ছিল না। এ-অবস্থায় ব্যক্তি নিজের মতো করে বানান ব্যবহার করত। এতে বানানের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, শুরু হয় বাংলা বানানে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন উৎস থেকে শব্দ এসেছে, যেমন–সংস্কৃত, আরবি-ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি। বাংলায় আগত শব্দগুলোর মূল উচ্চারণ এবং বাংলা ভাষার ধ্বনিব্যবস্থা অনুসারে সেগুলো লেখার প্রেরণা থেকেই উদ্ভাবিত হয় বাংলা বানানের নিয়ম। এক্ষেত্রে প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় 'বাংলা' শব্দের বানানের নিয়ম। পরবর্তীকালে বাংলা বানানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোগী হয়েছে। আমাদের দেশে বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড, বাংলা একাডেমি বানানরীতি তৈরি করেছে। পরবর্তীতে টেক্সট বুক বোর্ড ও বাংলা একাডেমির বানানরীতি এক হয়েছে। বাংলা একাডেমির বানানরীতি এখন সর্বত্র মানা হচ্ছে।

৬.২ বানানের নিয়ম

নিচে বাংলা বানানের কিছু নিয়ম উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হলো :

১. বিদেশি শব্দের (ইংরেজি, আরবি-ফারসি ও অন্যান্য ভাষার শব্দ) বানানে সব সময় হ্রস্ব ই বা ই-কার (ি) হবে। যেমন– জাফরানি, মিশনারি, ফিরিস্তি, উর্দি, বনেদি প্রভৃতি।

২. বাংলা শব্দের বানানে সব সময় হ্রস্ব ই বা ই-কার (ি) হবে। যেমন– ডুলি, হাঁড়ি, বাঁশি, চাঙারি প্রভৃতি।

৩. ভাষা ও জাতিবাচক শব্দের শেষে হ্রস্ব ই-কার হবে। যেমন– বাঙালি, ইংরেজি, ইরানি, পাঞ্জাবি, ইরাকি, পাকিস্তানি, জাপানি প্রভৃতি।

৪. ইংরেজি শব্দে a-উচ্চারণ যেখানে অ্যা সেখানে-এর জন্য অ্যা, s-এর উচ্চারণ যেখানে দন্তমূলীয় স্ সেখানে s-এর জন্য স, যেখানে শ এর জন্য sh এবং st-এর জন্য স্ট হবে। যেমন– অ্যাডভোকেট, অ্যাটোর্নি, বাস, সুগার, আর্টিস্ট, স্টেশন, স্টোর প্রভৃতি।

৫. সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে 'র'-এর পরে 'ণ' (মূর্ধন্য-ণ) হবে। যেমন– চরণ, কারণ, রণ, মরণ, অনুসরণ প্রভৃতি।

৬. বাংলা শব্দে র-এর পর ন হবে। যেমন– ধরন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও :

১। বানান বলতে কী বোঝায়?

ক. বর্ণন খ. বর্ণনা করা গ. বর্ণিল ঘ. বিশ্লেষণ

২। পরিপূর্ণভাবে ধ্বনি অনুযায়ী কোন নিয়ম বিশ্বের কোনো ভাষায় নেই?

ক. বানান লেখার নিয়ম খ. ধ্বনির নিয়ম গ. শব্দগঠনের নিয়ম ঘ. ব্যাকরণের নিয়ম

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বানানের উপর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?

ক. বাঙলা শব্দের বানানের নিয়ম খ. বাঙ্গলা শব্দের বানানের নিয়ম

গ. বাঙ্গাল শব্দের বানানের নিয়ম ঘ. বাঙ্গালা শব্দের বানানের নিয়ম

৪। 'বাঙ্গালা শব্দের বানানের নিয়ম' কখন প্রকাশিত হয়?

ক. ১৯৩৫ খ. ১৯৩৬ গ. ১৯৩৭ ঘ. ১৯৩৮

৫। বাংলাদেশে যে প্রতিষ্ঠানগুলো বানানরীতি তৈরি করেছে সেগুলো হলো–

i. বাংলাদেশ টেকস্ট বুক বোর্ড

ii. বাংলা একাডেমি

iii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৬। বিদেশি শব্দের বানানে সব সময় কী হবে?

ক. ণ খ. ই বা ই-কার গ. ষ ঘ. ঈ বা ঈ-কার

৭। জাতিবাচক শব্দে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক. দীর্ঘ ঈ-কার খ. হ্রস্ব ই-কার গ. হ্রস্ব উ-কার ঘ. কোনোটি নয়

৮। কোন বানানগুলো ঠিক?

ক. ডুলি, চরণ খ. মরন, শানকী গ. গহিণ, বনেদী ঘ. আর্টিষ্ট, অণুসরন

৭. বিরামচিহ্ন

কথা বলার সময় বাক্যের শেষে আমরা থামি। কোনো বাক্যে আমরা কোনোকিছুর বিবরণ দিই। কোনো বাক্যে কিছু জানতে চাই। কোনো বাক্যে প্রকাশ করি বিস্ময়ের ভাব। আবার কোনো কথার অর্থ স্পষ্ট করার জন্য একই বাক্যের মাঝখানে মাঝে মাঝে থামতে হয়। বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের শেষে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখানোর জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, সেগুলোই **বিরামচিহ্ন** বা **যতিচিহ্ন** বা **ছেদচিহ্ন**।

৭.১ বিরামচিহ্নের ধারণা

কয়েকটি বিরামচিহ্ন বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু বিরামচিহ্ন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। নিচে এগুলোর পরিচয় দেওয়া হলো।

ক) বাক্যের শেষে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন : বাক্যের শেষে নিচের তিনটি বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয় :

দাঁড়ি (।) : বাক্যের সমাপ্তি বা পূর্ণ-বিরতি বোঝাতে বাক্যের শেষে **দাঁড়ি** বা **পূর্ণচ্ছেদ** ব্যবহৃত হয়–

পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমাদের রাস্তা।
রাস্তা হেয়ার-পিনের মতো এঁকেবেঁকে উপরের দিকে উঠেছে।
আবদুল লতিফ পাহাড়ের পথ দিয়ে মোটর চালাতে সিদ্ধহস্ত।

প্রশ্নচিহ্ন বা জিজ্ঞাসাচিহ্ন (?) : প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বোঝাতে **প্রশ্নচিহ্ন বা জিজ্ঞাসাচিহ্ন** ব্যবহৃত হয়–

তোমার নাম কী?
নতুনদাকে বাঘে নিল না তো রে?
এবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

বিস্ময়চিহ্ন (!) : হৃদয়াবেগ (ভয়, ঘৃণা, আনন্দ ও দুঃখ ইত্যাদি) প্রকাশ করতে এবং সম্বোধন পদের পরে **বিস্ময়চিহ্ন** ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ওরে বাবা! কত বড় সাপ!
আহা! কী চমৎকার দৃশ্য!
হায়! হায়! ছেলেটা এতিম হয়ে গেল!
মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না।

খ) বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন : বাক্যের মধ্যে সাধারণত নিচের বিরামচিহ্নগুলো বসে :

কমা (,) : বাক্যের মধ্যে অল্প বিরতির জন্য কমা ব্যবহৃত হয়। বাক্যে অনেক ক্ষেত্রে কমা বসে–

ক) বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা বা অর্থ-বিভাগ দেখানোর জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন, সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন– সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।

খ) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি পদগুলোর পর কমা বসে। যেমন : সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।

গ) সম্বোধন পদের পরে কমা বসে। যেমন : নিপা, এদিকে তাকাও।

ঘ) উদ্ধরণ চিহ্নের আগে কমা বসে। যেমন– রনি বলল, "কাল স্কুল খুলবে।"

ঙ) মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর কমা বসে। যেমন– ৮ই মাঘ, বুধবার, ১৩৭৫ সাল।

চ) বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসে। যেমন– ৯, ইকবাল রোড, ঢাকা ১২০৭।

ছ) সমজাতীয় একাধিক পদ পরপর থাকলে কমা বসে। যেমন– পদ্মা, মেঘনা, যমুনা আর ব্রহ্মপুত্র আমাদের বড় নদী।

জ) এক ধরনের পদ জোড়ায় জোড়ায় থাকলে প্রতি জোড়াকে আলাদা করতে কমা বসে। যেমন– মামা-মামি, চাচা-চাচি, ফুফা-ফুফি আমাদের সঙ্গে বনভোজনে গিয়েছিলেন।

ঝ) এক ধরনের একাধিক বাক্যাংশকে আলাদা করতে কমা বসে। যেমন– আমাদের আছে শহিদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, নজরুল-জয়ন্তী।

সেমিকোলন (;) : কমার চেয়ে বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে সেমিকোলন বসে। যেমন– সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ আমরা; এ-মায়ার বন্ধন কি কখনো ছিন্ন করা যায়?

কোলন (:) : একটি পূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন– সভায় সিদ্ধান্ত হলো : এক মাস পরে নতুন সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ড্যাশ (—): যৌগিক ও মিশ্রবাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা ততোধিক বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাশচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন– তোমরা দরিদ্রের উপকার কর– এতে তোমাদের সম্মান যাবে না– বাড়বে।

হাইফেন (-) : সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন – এ আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি-উপহার।

উদ্ধরণ চিহ্ন (" ") : বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে উদ্ধরণ চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন– শিক্ষক বললেন, "গতকাল জাপানে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে।"

বন্ধনী-চিহ্ন ( ), { }, [ ] : বন্ধনী চিহ্ন গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– তিনি ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) জন্মগ্রহণ করেন।

বিন্দু চিহ্ন (.) : শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিন্দু চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন : তিনি পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। রাজু এবার এস.এস.সি. পাস করেছে।

৭.২ বিবৃতিমূলক [হাঁ-বোধক, না-বোধক], প্রশ্ন, বিস্ময় ও অনুজ্ঞা বাক্যে বিরামচিহ্ন

বিবৃতিমূলক বাক্য :

ক) হাঁ-বোধক : ছোটবেলা থেকে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।
সমুদ্রে নানারকম প্রাণী বাস করে।
নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ।

না-বোধক : মনটা ভালো না।
না, শুধু শহর নয়, সমগ্র অঞ্চলটা সর্বত্র প্রসিদ্ধ ও চিরপরিচিত।
তুমি নিশ্চয়ই জানতে– কোনোমতেই তাকে বিরত করা যাবে না।

প্রশ্নবোধক বাক্য : কী করে তুমি এ-কাজ করলে?
সেই সন্ধ্যাটা আবার কবে আসবে?
বড় বড় কথার আমরা কী বুঝি?

বিস্ময়বোধক বাক্য : এত নীচ তুমি!
আবার শ্রী–কান্ত!

অনুজ্ঞাবোধক বাক্য : মন দিয়ে পড়।
অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়।
ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
কাজটি করে দাও না ভাই।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও :

১। বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের শেষে কী ব্যবহার করা হয়?

ক. দাঁড়ি খ. প্রশ্নচিহ্ন গ. বিস্ময়চিহ্ন ঘ. বিরামচিহ্ন

২। দাঁড়িচিহ্নের জন্য কত সময় থামতে হয়?

ক. এক সেকেন্ড খ. দুই সেকেন্ড গ. তিন সেকেন্ড ঘ. চার সেকেন্ড

৩। হৃদয়াবেগ প্রকাশ পায় যার মধ্য দিয়ে তা হলো–

i. ভয়

ii. ঘৃণা

iii. আনন্দ ও দুঃখ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৪। কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে কোন চিহ্ন বসে?

ক. কোলন খ. সেমিকোলন গ. দাঁড়ি ঘ. হাইফেন

৫। সম্বোধন পদের পরে কী বসে?

ক. কোলন খ. সেমিকোলন গ. কমা ঘ. হাইফেন

৬। সমজাতীয় একাধিক পদ পরপর থাকলে কী বসে?

ক. কোলন খ. সেমিকোলন গ. কমা ঘ. হাইফেন

৭। শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?

ক. কোলন খ. সেমিকোলন গ. কমা ঘ. বিন্দু

৮। যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা ততোধিক বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?

ক. কোলন খ. ড্যাশ গ. কমা ঘ. বিন্দু

৯। সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?

ক. কোলন খ. সেমিকোলন গ. কমা ঘ. হাইফেন

১০। ত্রিপুরার অন্তর্গত ছিল কোন জেলা?

ক. চট্টগ্রাম খ. বরিশাল গ. সিলেট ঘ. কুমিল্লা

১১। 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়'– এটি কোন জাতীয় বাক্য?

ক. বিস্ময়বোধক খ. বিবৃতিমূলক গ. অনুজ্ঞাবোধক ঘ. অনুরোধসূচক

৮. অভিধান

অভিধান বলতে শব্দের সংগ্রহ-জাতীয় গ্রন্থকে বোঝায়। একটি ভাষিক সম্প্রদায় তাদের মুখের ও লিখিত ভাষায় যেসব শব্দ ব্যবহার করে সেইসব শব্দ অভিধানে ভুক্তি দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হয় না। অভিধানে প্রতিটি শব্দের বিস্তৃত পরিচয় লেখা থাকে। যেমন– শব্দটির উৎস কী, কীভাবে তা তৈরি হয়েছে, এর প্রাচীন ও বর্তমান ব্যবহার কেমন, এর উচ্চারণ কেমন, শব্দটি বিশেষ্য না বিশেষণ নাকি অন্য কোনো শ্রেণির ইত্যাদি। অভিধান বানান শেখার জন্য বিশ্বস্ত গ্রন্থ।

৮.১ বাংলা অভিধান

বাংলা ভাষার অভিধান রচনার প্রথম চেষ্টা করেন খ্রিষ্টান মিশনারি মানুএল দা আসসুম্পসাঁউ। তাঁর রচিত বাংলা-পোর্তুগিজ ভাষার শব্দকোষ (Vocabulario em idioma Bengala e Portugez) গ্রন্থটি ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রণীত বঙ্গভাষাভিধান-কে প্রথম বাংলা অভিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে বহু বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশে অভিধান প্রণয়নে বাংলা একাডেমির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে বাংলা একাডেমি থেকে বাংলা ভাষার অভিধান ছাড়াও বেশ কিছু বিশেষায়িত অভিধান; যেমন—বানান অভিধান, উচ্চারণ অভিধান, বিজ্ঞান অভিধান, ঐতিহাসিক অভিধান, বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিক অভিধান ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে।

৮.২ অভিধানে শব্দভুক্তির নিয়ম : বর্ণানুক্রমিক শব্দ সাজানো

অভিধানে শব্দ সাজানোকে বলা হয় ভুক্তি। সব ভাষার অভিধানেই শব্দের এ-ভুক্তি নির্দিষ্ট ভাষার বর্ণক্রম অনুসারে হয়। বাংলায় ১১টি স্বরবর্ণ এবং ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে। যেমন–

স্বরবর্ণ : অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণ : ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম
য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ।

অভিধানে এই ক্রম ঠিক এভাবে অনুসরণ করা হয়নি। সামান্য কিছু বৈচিত্র্য এক্ষেত্রে রয়েছে। বাংলা অভিধানে গৃহীত বর্ণানুক্রম নিম্নরূপ :

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ ;

ক ক্ষ খ গ ঘ ঙ; চ ছ জ ঝ ঞ ; ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ ; ত থ দ ধ ন ; প ফ ব ভ ম ;
য (য়) র ল শ ষ স হ।

উল্লেখ্য যে, ং ঃ ঁ স্বরবর্ণের পরে ও ব্যঞ্জনবর্ণের আগে ব্যবহৃত হয়। আর 'ক্ষ' যুক্তবর্ণ হলেও অভিধানে ক-বর্ণের পরে বর্ণরূপে প্রয়োগ হয়।

যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম :

ক্ক ক্ট ক্ত ক্ষ ক্স গ্ন গ্ধ ঙ্ক ঙ্ক্ষ ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ঙ্ম চ্চ চ্ছ জ্জ জ্ঝ জ্ঞ ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ট্ট ড্ড ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড ণ্ট ণ্ণ ত্ত ত্থ দ্গ দ্দ দ্ধ ন্ট ন্ঠ ন্ড ন্ত ন্থ ন্দ ন্ধ ন্ন ন্ম প্ট প্ত প্ল প্স ব্জ ব্দ ব্ধ ম্প ম্ফ ম্ব ম্ভ ম্ম ল্ক ল্গ ল্ট ল্প ল্ম ল্ল শ্চ ষ্ক ষ্ট ষ্ঠ ষ্ণ ষ্প ষ্ফ ষ্ম স্ক স্ট স্ত স্থ স্প স্ফ হ্ণ হ্ন হ্ম।

কার চিহ্ন : া ি ী ু ূ ৃ ে ৈ ো ৌ।

ফলা চিহ্ন : ´ ্য ্র।

অভিধানে ব্যবহৃত বর্ণানুক্রমিক শব্দ

বাংলা অভিধানের শব্দগুলো যেভাবে বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে তার কিছু নমুনা নিচে উল্লেখ করা হলো :

অ

অনাথ [অনাথ] *বিণ* এতিম; মা-বাবা এবং অভিভাবক নেই যেসব শিশুর।

অবনি, অবনী (বিরল) [অবোনি] *বি* পৃথিবী; ধরা; জগৎ।

আ

আক্কেল [আক্‌কেল] *বি* ১. বুদ্ধি; বিবেচনা; কাণ্ডজ্ঞান।

উ

উনুন [উনুন] *বি* চুলা।

ক

কিচিরমিচির [কিচির্‌মিচির্‌] *বি* ক্ষুদ্র পশুপাখির একসঙ্গে কোলাহল ধ্বনি।

কুমোর [কুমোর] *বি* কুম্ভকার; মাটি দিয়ে পুতুল, পাত্র, প্রতিমা তৈরি করা যাদের পেশা।

খ

খিড়কি, খিড়কী [খিড়কি] *বি* জানালা; বাতায়ন।

গ

গচ্ছা [গচ্‌ছা] *বি* অনর্থক অর্থদণ্ড; ক্ষতিপূরণ।

ছ

ছিন্ন [ছিন্‌নো] *বিণ* ছেঁড়া।

ছোপ [ছোপ] *বি* রঙের পোঁচ।

ড

ডাগর [ডাগোর] *বিণ* বৃহৎ; বড় (ডাগর চোখ, ডাগর মেয়ে)।

ত

তারিফ [তারিফ্‌] *বি* প্রশংসা; বাহবা।

তেজস্বী [তেজোশ্‌শি] *বিণ* শক্তিশালী; তেজোময়।

দ

দরবার [দর্‌বার্] *বি* রাজসভা; জলসা।

দিব্যি [দিব্‌বি] *বিণ* ভালোভাবে; উত্তম; চমৎকার; পরিষ্কার করে।

ন

নিখিল [নিখিল্] *বিণ* সমগ্র; পুরো; সমুদয়।

নিরানন্দ [নিরানোন্‌দো] *বিণ* আনন্দহীন; বিষণ্ণ; অসুখী।

নিয়তি [নিয়োতি] *বি* ভাগ্য; অদৃষ্ট; নসিব।

শ

শীর্ণ [শির্‌নো] *বিণ* কৃশ; ক্ষীণ; রোগা।

স

সচরাচর [শচরাচর্] *ক্রিবিণ* সাধারণত; প্রায়শ; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও :

১। শব্দের সংগ্রহ-জাতীয় গ্রন্থকে কী বলে?

ক. অভিধান খ. শব্দকোষ গ. শব্দার্থকোষ ঘ. শব্দমালা

২। বাংলা ভাষার অভিধান রচনার প্রথম চেষ্টা করেন কে?

ক. রাজা রামমোহন রায় খ. উইলিয়াম কেরি গ. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ঘ. মানুএল দা আসসুম্পসাঁউ

৩। বাংলা-পোর্তুগিজ ভাষার শব্দকোষ গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. রাজা রামমোহন রায় খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ঘ. উইলিয়াম কেরি

৪। বাংলা-পোর্তুগিজ ভাষার শব্দকোষ কখন প্রকাশিত হয়?

ক. ১৭৪১ খ. ১৭৪২ গ. ১৭৪৩ ঘ. ১৭৪৪

৫। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রণীত অভিধানের নাম কী?

ক. সরল বাংলা অভিধান খ. বঙ্গভাষাভিধান গ. ডিকশনারি ঘ. ব্যবহারিক বাংলা অভিধান

৬। 'বঙ্গভাষাভিধান' কখন প্রকাশিত হয়?

ক. ১৮১৬ খ. ১৮১৭ গ. ১৮১৮ ঘ. ১৮১৯

৭। অভিধানে শব্দ সাজানোকে কী বলে?

ক. ভুক্তি　　খ. গ্রহণ　　গ. অনুপ্রবেশ　　ঘ. প্রবেশ

৮। অভিধানে ব্যবহৃত বর্ণানুক্রম কোনটি ঠিক?

ক. ক আ অ উ　　খ. উ ঋ ছ অ　　গ. জ দ র আ　　ঘ. ও ঔ ং ঃ

৯। যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম কোনটি ঠিক?

ক. ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ক জ্ঞ ঞ্ঝ　　খ. ঞ্জ ট্ট ড্ড ড়গ ণ্ট　　গ. ন্ট ড ন্ঠ ন্ত হ্ন　　ঘ. স্প স্ফ স্ঞ স্ম স্ক

১০। অভিধানে ব্যবহৃত বর্ণানুক্রমিক শব্দ কোনটি ঠিক?

ক. আক্কেল, অনাথ　　খ. গচ্ছা, কুমোর　　গ. তারিফ, ছোপ　　ঘ. নিখিল, সচরাচর

খ. নির্মিতি

১. অনুধাবন

কোনো বিষয় পাঠ করে তার মূলভাব বুঝতে পারার ক্ষমতাকে অনুধাবন-দক্ষতা বলে। যার অনুধাবন-দক্ষতা যত বেশি, সে একটি বিষয় তত দ্রুত বুঝতে পারে। অনুধাবন-দক্ষতা যে কোনো বিষয়কে ভালোভাবে আয়ত্ত করতে সাহায্য করে। কোনো বিষয় না-বুঝে মুখস্থ করলে তা বেশি দিন মনে থাকে না। বিষয়টি বুঝে চর্চা করলে তা স্থায়ী হয়। এভাবে বোঝা ও লেখার চর্চা করাই হলো অনুধাবন। অনুধাবন-দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত চর্চা করতে হয়। বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে বোঝার জন্য শব্দের অর্থ, বাক্য এবং বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।

১.১ অনুধাবন পরীক্ষা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১. দিনের বেলা সোনার থালার মতো সূর্য তার কিরণ ছড়ায় চারপাশে। এমনি সময়ে সচরাচর আকাশ নীল। কখনো সাদা বা কালো মেঘে ঢেকে যায়। ভোরে বা সন্ধ্যায় আকাশের কোনো কোনো অংশে নামে রঙের বন্যা। কখনো-বা সারা আকাশ ভেসে যায় লাল আলোয়। রাতের আকাশ সচরাচর কালো হয়, কিন্তু সেই কালো চাঁদোয়ার গায়ে জ্বলতে থাকে রুপালি চাঁদ আর অসংখ্য ঝকঝকে তারা ও গ্রহ।

ক. দিনের বেলা আকাশের রং কেমন থাকে?

খ. রাতের বেলা আকাশে চাঁদ ও তারা দেখা যায় কেন?

গ. দিন ও রাতে আকাশে রঙের যে পার্থক্য দেখা যায় তা লেখ।

ঘ. তোমার দেখা আকাশের সঙ্গে অনুচ্ছেদের আকাশের মিল কোথায়?

ঙ. খালি চোখে দেখা আকাশ আর অনুচ্ছেদে বর্ণিত আকাশ কি একই? ব্যাখ্যা কর।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২. কলকাতার এক নোংরা বস্তিতে মাদার তেরেসা প্রথম স্কুল খুললেন। বেঞ্চ-টেবিল কিছু নেই, মাটিতে দাগ কেটে শিশুদের শেখাতে লাগলেন বর্ণমালা। অসুস্থদের সেবার জন্য খুললেন চিকিৎসাকেন্দ্র। ধীরে-ধীরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন অনেক মানুষ। মাদার তেরেসার কাজের পরিধি ক্রমাগত বেড়ে চলল। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন আরও অনেকে। তাঁদের নিয়ে তিনি গড়লেন মানবসেবার সংঘ 'মিশনারিজ অভ চ্যারিটি'।

ক. মাদার তেরেসার গঠিত সংঘটির নাম কী?

খ. মাদার তেরেসাকে কেন মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল?

গ. মাদার তেরেসা কীভাবে মানবসেবায় এগিয়ে আসলেন? সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও।

ঘ. 'মানবসেবার জন্য অর্থের দরকার নাই, দরকার সদিচ্ছা'– উক্তিটি বুঝিয়ে দাও।

ঙ. মাদার তেরেসার এই কাজ কী নামে অভিহিত করা যায়?

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

৩. রাজার দল এখন আর নেই। গুপ্ত-খড়্গ, পাল-সেন, পাঠান-মুঘল, কোম্পানি-রানি এদের কাল শেষ হয়েছে। আজকের দুই কবিও হয়তো দুই প্রান্তে বসে কবিতা লিখছেন। একজন লিখছেন সমৃদ্ধির কথা, বিলাসের কথা, আনন্দের কথা: আরেকজন ছবি আঁকছেন নিদারুণ অভাবের, জ্বালাময় দারিদ্র্যের, অপরিসীম বেদনার।

ক. কীসের দল এখন আর নেই?

খ. কাদের দিন শেষ হয়েছে? কেন?

গ. দুই কবির মিল কোন দিক থেকে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'দুই কবির মধ্যে মিল থাকা সত্ত্বেও বিস্তর ব্যবধান।'– বুঝিয়ে দাও।

ঙ. দ্বিতীয় কবির ভাবনা একটি উদহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২. সারাংশ ও সারমর্ম রচনা

সারাংশ

কোনো নির্দিষ্ট দীর্ঘ রচনাকে সহজবোধ্য করে এর বিষয়বস্তু লেখা বা পরিবেশন করাকে সারাংশ বলে। সারাংশ লেখার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সেগুলো অবশ্যই মানতে হবে। প্রথমেই অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে মূল রচনাটি পড়তে হবে। একবার পড়ে বক্তব্য স্পষ্ট না হলে একাধিকবার পড়তে হবে। লেখার সময় অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, কোনো অপ্রয়োজনীয় কিছু লেখা যাবে না। বক্তব্য যত সহজে বলা যায় ততই ভালো। মূলে কোনো দৃষ্টান্ত, কোনোকিছুর সঙ্গে তুলনা করে কোনো উদাহরণ দেওয়া থাকলে তা বাদ দিতে হবে। সারাংশ সবসময়ই মূলের থেকে ছোট হবে।

২.১ সারাংশ লিখন

এক

ভাত বাঙালির বহুকালের প্রিয় খাদ্য। এ অঞ্চলের সরু সাদা চালের গরম ভাতের কদর সবচাইতে বেশি ছিল বলে মনে হয়। পুরোনো সাহিত্যে ভালো খাবারের নমুনা হিসেবে যে-তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা হলো কলার পাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, নালিতা শাক, মৌরলা মাছ আর খানিকটা দুধ। লাউ, বেগুন ইত্যাদি তরকারি প্রচুর খেত সেকালের বাঙালিরা, কিন্তু ডাল তখনো বোধহয় খেতে শুরু করেনি। মাছ তো প্রিয় বস্তুই ছিল। বিশেষ করে ইলিশ মাছ। শুঁটকির চল সেকালেও ছিল বিশেষ, করে দক্ষিণাঞ্চলে। ছাগলের মাংস সবাই খেত। হরিণের মাংস বিয়েবাড়িতে বা এরকম উৎসবে দেখা যেত। পাখির মাংসও তা-ই। সমাজের কিছু লোক শামুক খেত। ক্ষীর, দই, পায়েস, ছানা– এসব ছিল বাঙালির নিত্যপ্রিয়। আম-কাঁঠাল, তাল-নারকেল ছিল প্রিয় ফল। খুব চল ছিল নাড়ু, পিঠেপুলি, বাতাসা, কদমা– এসবের। মসলা-দেওয়া পান খেতে সকলে ভালোবাসত।

সারাংশ : বাঙালি জাতির জীবনযাত্রার খাদ্যাভ্যাস অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকে এদেশের মানুষ বিচিত্র ধরনের সাধারণ খাবার খেত। উৎসব বা বিয়েতে হরিণের মাংস পরিবেশন করা হতো। সমাজের সকল স্তরের ও অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস প্রায় একই ধরনের ছিল।

দুই

মা-মরা মেয়ে মিনু। বাবা জন্মের আগেই মারা গেছে। সে মানুষ হচ্ছে এক দূরসম্পর্কের পিসিমার বাড়িতে। বয়স মাত্র দশ, কিন্তু এ-বয়সেই সব রকম কাজ করতে পারে সে। লোকে অবশ্য বলে যোগেন বসাক মহৎ লোক বলেই অনাথা বোবা মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছেন। মহৎ হয়ে সুবিধাই হয়েছে যোগেন বসাকের। পেটভাতায় এমন সর্বগুণান্বিতা চব্বিশ ঘণ্টার চাকরানি পাওয়া শক্ত হতো তাঁর পক্ষে। বোবা হওয়াতে আরও সুবিধা হয়েছে, নীরবে কাজ করে। মিনু শুধু বোবা নয়, কালাও। অনেক চেঁচিয়ে বললে, তবে শুনতে পায়। সব কথা শোনার দরকার হয় না তার। ঠোঁটনাড়া আর মুখের ভাব দেখে সব বুঝতে পারে। এ ছাড়া তার আর-একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে যার সাহায্যে সে এমন সব জিনিস বুঝতে পারে, এমন সব জিনিস মনে-মনে সৃষ্টি করে, সাধারণত বুদ্ধিতে যার মানে হয় না। মিনুর জগৎ চোখের জগৎ, দৃষ্টির ভেতর দিয়েই সৃষ্টিকে গ্রহণ করেছে সে।

সারাংশ : সমাজ বিচিত্র মানুষের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। কেউ সর্বাঙ্গে সুস্থ, কেউ-বা সম্পূর্ণভাবে সুস্থ নয়। বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী হয়ে ছোট্ট মেয়ে মিনু দুঃখ কষ্টে জর্জরিত। তারপরও জীবনকে তুচ্ছ মনে না করে সে কর্মের মধ্য দিয়ে নিজের জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছে।

তিন

আগেকার দিনে লোকে ভাবত, আকাশটা বুঝি পৃথিবীর উপর একটাকিছু কঠিন ঢাকনা। কখনো তারা ভাবত, আকাশটা পরতে পরতে ভাগ করা।

আজ আমরা জানি, আকাশের নীল চাঁদোয়াটা সত্যি সত্যি কঠিন কোনো জিনিসের তৈরি নয়। আসলে এ নিতান্তই গ্যাস-ভর্তি ফাঁকা জায়গা। হরহামেশা আমরা যে আকাশ দেখি তা হলো আসলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঢাকনা। সেই বায়ুমণ্ডলে রয়েছে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড - এমনি গোটা কুড়িটি বর্ণহীন গ্যাসের মিশেল। আর আছে পানির বাষ্প ধুলোর কণা।

সারাংশ : আকাশকে একসময় মানুষের মাথার উপর ঢাকনা মনে করা হতো। আসলে তা ঢাকনা নয়, রং বায়ুর বিপুল স্তর। এখানে প্রায় বিশটি বর্ণহীন গ্যাস ও পানির বাষ্প আর ধুলোর কণা মিশে আছে।

চার

আগেকার দিনে আমাদের আকাশ নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন শূন্যে বেলুন পাঠিয়ে বা যন্ত্রপাতিসুদ্ধ রকেট পাঠিয়ে। আজ মানুষ নিজেই মহাকাশযানে চেপে সফর করছে পৃথিবীর উপরে বহু দূর পর্যন্ত। পৃথিবী ছাড়িয়ে তারা যেতে পেরেছে চাঁদে। পৃথিবীর উপর দেড়শো দুশো মাইল বা তারও অনেক বেশি উপর দিয়ে ঘুরছে অসংখ্য মহাকাশযান। যেখান দিয়ে ঘুরছে সেখানে হাওয়া নেই বললেই চলে।

মহাকাশযান থেকে দিনরাত তোলা হচ্ছে পৃথিবীর ছবি। জানা যাচ্ছে কোথায় কখন আবহাওয়া কেমন হবে, কোন দেশে কেমন ফসল হচ্ছে। মহাকাশযান থেকে ঠিকরে দেওয়া হচ্ছে টেলিফোন আর টেলিভিশনের সংকেত। এজন্য দূরদেশের সঙ্গে যোগাযোগ আজ অনেক সহজ হয়ে উঠেছে।

সারাংশ : বর্তমানে বেলুনের পরিবর্তে মহাকাশযান পাঠিয়ে আকাশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আর এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগব্যবস্থা বিস্তৃত হয়েছে। টেলিভিশন, ফোন, সেলফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে সংকেত।

সারমর্ম

প্রদত্ত পাঠের সংক্ষিপ্ত মর্ম তথা সার উল্লেখ করাকে সারমর্ম বলা হয়। ইংরেজি Substance-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে সারমর্ম শব্দটি ব্যবহৃত হয়। একে মর্মসত্য বা মর্মার্থ বলা হয়। সারাংশ লেখার ক্ষেত্রে সহজভাবে আসল বক্তব্য অনুধাবন করে লিখতে হয়। সারমর্ম লেখার জন্য মূল রচনার মধ্য দিয়ে কী বলা হয়েছে, তা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে হয়। আমরা মনে রাখব, সারাংশ বিষয়সংক্ষেপ আর সারমর্ম বিষয়ের অন্তর্নিহিত বক্তব্য। সারমর্ম যেহেতু বিষয়ের অন্তর্নিহিত বক্তব্য, তাই তা প্রদত্ত বিষয়ের চেয়ে আকারে ছোট করে লিখতে হয়।

২.২ সারমর্ম লিখন

এক

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মা গো, তোমায় ভালোবেসে॥
জানি নে তোর ধনরতন
আছে কি না রানির মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন বনেতে জানি নে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে॥
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে॥

সারমর্ম : ধনরত্নে পূর্ণ না থাকলেও মাতৃভূমি প্রতিটি মানুষের কাছেই প্রিয়। স্বদেশ পূর্ণতা দেয়, আর এজন্য মানুষ শেষ আশ্রয়টুকু দেশের মাটিতেই চায়।

দুই

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ ;
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদ না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

সারমর্ম : ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সুখ। অন্যকে বাদ দিয়ে কেউ একা চলতে পারে না। সুখী হতে পারে না। সব মানুষেরই দায়িত্ব অন্যের আনন্দ-বেদনাকে নিজের বলে গ্রহণ করা। এভাবেই সমাজে সকল মানুষ সুখী হতে পারে।

তিন

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথি।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলো ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারই সমান রাঙা।

সারমর্ম : জাতি, ধর্ম, গাত্রবর্ণে পার্থক্য থাকলেও এসকল পরিচয়ের উর্ধ্বে হচ্ছে মানুষ জাতি। সব মানুষের অনুভূতিই সমান। মানুষে-মানুষে পার্থক্য করা তাই অন্যায়। সকলের অনুভূতিকে মূল্য দিয়ে একসঙ্গে জীবনযাপন করলেই পৃথিবী সুন্দর হবে।

অনুশীলনী

সারাংশ লেখ :

১. সাজসজ্জার দিকে বেশ ঝোঁক ছিল প্রাচীন বাঙালির। চুলের বাহার ছিল দেখবার মতো। মাথার উপরে চুড়ো করে বাঁধত চুল। এখন মেয়েরা যেমন ফিতে বাঁধে চুলে, তখন শৌখিন পুরুষেরা অনেকটা তেমনি করে কোঁকড়া চুল কপালের উপর বেঁধে রাখত। মেয়েরা নিচু করে 'খোঁপা' বাঁধত – নয়তো উঁচু করে বাঁধত 'ঘোড়াচূড়'। কপালে টিপ দিত, পায়ে আলতা, চোখে কাজল আর খোঁপায় ফুল। নানারকম প্রসাধনীও ব্যবহার করত তারা।

মেয়েরা তো বটেই, ছেলেরাও সে-যুগে অলংকার ব্যবহার করত। সোনার অলংকার পরতে পেত শুধু বড়লোকেরা। তাদের বাড়ির ছেলেরা সুবর্ণকুণ্ডল পরত, মেয়েরা কানে দিত সোনার 'তারঙ্গ'। হাতে, বাহুতে, গলায়, মাথায় সর্বত্রই সোনামণিমুক্তো শোভা অভিজাত তাদের মেয়েদের। সাধারণ পরিবারের মেয়েরা হাতে পরত শাঁখা, কানে কচি কলাপাতার মাকড়ি, গলায় ফুলের মালা।

২. আকাশ যদি বর্ণহীন গ্যাসের মিশেল, তবে তা নীল দেখায় কেন? মাঝে মাঝে সাদা আর লাল রঙের খেলাই-বা দেখি কী করে? আসলে সাদা মেঘে জলীয় বাষ্প জমে তৈরি হয় অতি ছোট ছোট অসংখ্য পানির কণা। কখনো মেঘে এসব কণার গায়ে বাষ্প জমার ফলে তা ভারী হয়ে বড় পানির কণা তৈরি হয়। তখন সূর্যের আলো তার ভেতর দিয়ে আসতে পারে না, আর তাই সে-মেঘের রং হয় কালো। কিন্তু সারাটা আকাশ সচরাচর নীল রঙের হয় কী করে, আকাশ নীল দেখায় বায়ুমণ্ডলে নানা গ্যাসের অণু ছড়িয়ে আছে বলে। এইসব গ্যাসের কণা খুব ছোট মাপের আলোর ঢেউ সহজে ঠিকরে ছিটিয়ে দিতে পারে। এই ছোট মাপের আলোর ঢেউগুলোই আমরা দেখি নীল রং হিসেবে। অর্থাৎ পৃথিবীর উপর হাওয়ার স্তর আছে বলেই পৃথিবীতে আকাশকে নীল দেখায়।

সারমর্ম লেখ :

১

নাই কিরে সুখ? নাই কিরে সুখ?—
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?
যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
কেবলি কি নর জনম লয়?—
বল ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈঃস্বরে—
না—, না—, না—, মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।
কার্যক্ষেত্র ঐ প্রশস্ত পড়িয়া
সমর-অঙ্গন সংসার এই,
যাও বীরবেশে কর গিয়া রণ;
যে জিতিবে সুখ লভিবে সে-ই।

২

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে,
আলুথালু ঘুমু যাও রোদে গলা দুপুরে।
প্রজাপতি ডেকে যায়—
'বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয়!'
আসমানে তারা চায়—
'চলে আয় এ অকূল!'
ঝিঙে ফুল ॥
তুমি বলো— 'আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মা'য়,
চাই না ও অলকায়—
ভালো এই পথ-ভুল!'
ঝিঙে ফুল ॥

৩. ভাবসম্প্রসারণ

প্রতিটি ভাষায়ই এমন কিছু বাক্য রয়েছে, যেগুলোতে লুকিয়ে আছে গভীর ভাব। কবি, সাহিত্যিক, মনীষীদের রচনা কিংবা হাজার বছর ধরে প্রচলিত প্রবাদ প্রবচনে নিহিত থাকে জীবনসত্য। এ-ধরনের গভীর ভাব বিশ্লেষণ করে তা সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়াকে বলে ভাবসম্প্রসারণ। ভাবসম্প্রসারণে যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে মূলভাব পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করতে হবে। ভাবসম্প্রসারণ লেখার সময় নিচের বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হবে :

১. উদ্ধৃত অংশটি মনোযোগ দিয়ে বারবার পড়ে এর মূলভাব উদ্ধার করতে হবে। লেখার উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে এমন কিছু শব্দ থাকে যার অর্থ বুঝতে পারলে মূলভাব বোঝা সহজ হয়। তাই প্রতিটি শব্দের অর্থ খুঁজে বুঝতে হবে।

২. মূলভাব সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণনা করতে হবে। একই বিষয় বারবার লেখা যাবে না। অবান্তর কথা লেখা যাবে না। উদ্ধৃত অংশে কোনো উপমা বা রূপক থাকলে তার অর্থ বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৩. মূলভাব স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ, উদ্ধৃতি ইত্যাদি দেওয়া যাবে। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে লেখকের নাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

৪. ভাবসম্প্রসারণের আয়তন প্রবন্ধের মতো বড় বা সারাংশের মতো ছোট হবে না।

নিচে ভাবসম্প্রসারণের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

৩.১ গদ্য

১. চরিত্র মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ।

ভাবসম্প্রসারণ : মানবজীবনে চরিত্র মুকুটস্বরূপ। চরিত্রবান ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে। চরিত্রহীনকে সকলে ঘৃণা করে। চরিত্রহীন ব্যক্তির মানুষ হিসেবে কোনো মূল্য নেই।

চারিত্রিক গুণাবলির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের মহিমা প্রকাশ পায়। চরিত্রবান ব্যক্তি কতগুলো গুণের অধিকারী হন। সৎ, বিনয়ী, উদার, নম্র, ভদ্র, রুচিশীল, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, নির্লোভ, পরোপকারী ইত্যাদি গুণ চরিত্রবান ব্যক্তিকে মহত্ত্ব দান করে। এসব গুণ যদি মানুষের মধ্যে না থাকে, তাহলে সে পশুরও অধম বলে বিবেচিত হয়। চরিত্রবান ব্যক্তি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণে সমাজে ও জীবনে শ্রদ্ধাভাজন ও সমাদৃত হন। অন্যদিকে চরিত্রহীন ব্যক্তিকে কেউ ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে না, বরং ঘৃণা করে। চরিত্রবান ব্যক্তি জাগতিক মায়া-মোহ-লোভ-লালসার বন্ধনকে ছিন্ন করে লাভ করেন অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত সম্মান।

অর্থ-বিত্ত-গাড়ি-বাড়ি প্রভৃতির চেয়ে চরিত্র অনেক বড় সম্পদ। আর এ-মর্যাদা অর্থমূল্যে নয়, মানবিক ও নৈতিক পবিত্রতার মানদণ্ডে বিচার করতে হয়। সকলেরই উচিত চরিত্রবান হওয়ার সাধনা করা।

২. পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।

ভাবসম্প্রসারণ : সৌভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে কোনো মানুষের জন্ম হয় না। মানুষ কর্মের মাধ্যমে তার ভাগ্য গড়ে তোলে। পরিশ্রমই সৌভাগ্য বয়ে আনে। উদ্যম, চেষ্টা ও শ্রমের সমষ্টিই সৌভাগ্য।

যিনি জন্ম দান করেন তিনি প্রসূতি। মা যেমন সন্তানের প্রসূতি, তেমনি কঠোর পরিশ্রম হলো সৌভাগ্যের প্রসূতি বা উৎস। মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতে হয়। ভালো কাজের ফল ভালো, মন্দ কাজের ফল মন্দ। কোনো কাজই আবার সহজ নয়। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কঠিন কাজও সহজ হয়। জীবনে উন্নতি করতে হলে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। পরিশ্রম ছাড়া কেউ কখনো তার ভাগ্যকে গড়ে তুলতে পারেনি। জীবনে অর্থ, বিদ্যা, যশ, প্রতিপত্তি লাভ করতে হলে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে। ছাত্রজীবনে কঠোর পরিশ্রম করে শিক্ষালাভ না করলে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। পরিশ্রম ছাড়া জাতীয় উন্নতিও লাভ করা যায় না।

শ্রমই হলো উন্নতির চাবিকাঠি। যে-জাতি পৃথিবীতে যত বেশি পরিশ্রমী, সে-জাতি তত উন্নত। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই জাতীয় সৌভাগ্য অর্জন করা যায়।

৩. শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

ভাবসম্প্রসারণ : শিক্ষাই আলো, নিরক্ষরতা অন্ধকার। শিক্ষা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়, মানুষের অন্তরের প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলে। শিক্ষাহীন মানুষ আর অন্ধের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যে-জাতি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত সে-জাতি পঙ্গুত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে।

জীবন ছাড়া শরীর মূল্যহীন, শিক্ষা ছাড়া জীবনের কোনো মূল্য নেই। নিরক্ষর জনগোষ্ঠী জাতির জন্য বোঝাস্বরূপ। মাঝিবিহীন নৌকা চলতে পারে না, মেরুদণ্ডহীন মানুষও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি সফল হয় না। যে-দেশের লোক যত বেশি শিক্ষিত, সে-দেশ তত বেশি উন্নত। জাতীয় জীবনে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে শিক্ষার উপর। মানুষের পূর্ণ বিকাশের জন্যই শিক্ষা প্রয়োজন। শিক্ষা শুধু ব্যক্তিজীবনে উন্নতি বয়ে আনে না, সমাজ জাতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব রকম উন্নতিও সাধন করে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ আজ নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

উন্নতির একমাত্র চাবিকাঠি শিক্ষা। শিক্ষা ব্যক্তি ও জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ বয়ে আনে। তাই জাতিকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা একান্ত জরুরি।

৪. ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

ভাবসম্প্রসারণ : জীবন কর্মময়। কর্মশক্তির মূলে রয়েছে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর প্রবল আগ্রহ। আগ্রহের সঙ্গে নিষ্ঠা থাকলে অসাধ্যকে সাধন করা যায়।

মানুষকে সব বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করে ইচ্ছাশক্তি। প্রতিদিনই আমাদের কোনো-না-কোনো কাজ করতে হয়। পৃথিবীতে কোনো কাজই বিনা বাধায় করা যায় না। সব কাজেই কিছু-না-কিছু সুবিধা-অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি থাকে। সেই অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে পারলেই সাফল্য আসে। এজন্য প্রয়োজন প্রবল ইচ্ছা শক্তি। ইচ্ছা থাকলে কোনো কাজ আটকে থাকে না। ইচ্ছাই মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়। ইচ্ছাই সকল কর্মের প্রেরণা। দৃঢ় ইচ্ছার কাছে সকল বাধা হার মানে। প্রবল ইচ্ছা নিয়ে কোনো কাজ করলে অতি কঠিন কাজও শেষ করা যায়। পৃথিবীর মহান ব্যক্তিরা এভাবেই সব ধরনের বিপত্তি অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। সম্রাট নেপোলিয়ান তাঁর সেনাবাহিনীসহ আল্পস পর্বতের কাছে গিয়ে অসীম উৎসাহে বলে ওঠেন : 'আমার বিজয় অভিযানের মুখে আল্পস পর্বত থাকবে না।' আত্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি আল্পস পার হতে পেরেছিলেন।

মানুষের সকল কাজের মূল হলো ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাই মানুষকে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দেয়।

৩.২ কবিতা

১. আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

ভাবসম্প্রসারণ : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে তাকে বেঁচে থাকতে হয়।

সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের জীবন অর্থহীন। কারণ, সমাজে প্রতিটি মানুষ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি কেবল নিজের কথা ভাবে, সমাজের কথা ভাবে না, সে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ কখনোই সুখী হয় না। যারা নিজেদের কথা না ভেবে সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য জীবনকে বিলিয়ে দেয়, তারাই প্রকৃত মানুষ। অন্যের সুখের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করে, তাদের মতো সুখী আর কেউ নেই। সমাজে এরকম মানুষেরাই চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।

একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসাই প্রকৃত মানবধর্ম। আজকের এই সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে কাজ করেছে মানুষের শুভবুদ্ধি ও অন্যের কল্যাণ করার ইচ্ছা। ত্যাগের মাঝেই জীবনের সার্থকতা নিহিত, ভোগের মাঝে নয়।

২. স্বদেশের উপকারে নাই যার মন
কে বলে মানুষ তারে পশু সেই জন।

ভাবসম্প্রসারণ : নিজের দেশকে ভালোবাসার মতো মহান আর কিছু নেই। দেশ মানুষকে আশ্রয় দেয়, অন্ন দেয়, স্বাধীনতা দেয়।

যার নিজের কোনো দেশ নেই, তার মতো দুঃখী আর কেউ নেই। স্বদেশের উপকার করা প্রত্যেকটি নাগরিকেরই কর্তব্য। দেশের কল্যাণ করা মানে নিজের কল্যাণ করা। ইতিহাসে দেখা যায়, স্বদেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করতে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। কারণ তাঁরা জানতেন, একটি স্বাধীন দেশের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। অন্যদিকে যারা দেশকে কিছু দিতে চায় না বা পারে না, তারা মানুষ হিসেবে ব্যর্থ। হিংস্র পশু যেমন ক্ষুধা নিবারণের জন্য নিজের সন্তানকেও খেয়ে ফেলতে পারে, তেমনি তারা স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের দেশকে বিক্রি করে দিতে পারে। এ ধরনের লোকদের সকলেই ঘৃণা করে। তারা কারো কাছে সম্মান পায় না। তারা এক অর্থে পশুর চেয়ে অধম।

স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা করাই প্রকৃত মানুষের ধর্ম। স্বদেশপ্রীতি যার নেই সে পশুর সমান। এ-ধরনের মানুষ ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

ভাবসম্প্রসারণ : আজকের এই সভ্যতা বিকাশে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। নারী ও পুরুষ তাই সমান মর্যাদার অধিকারী।

কেবল পুরুষ কিংবা কেবল নারী থাকলে এ-পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকত না। অনেকে ভুল ধারণা পোষণ করেন, ভাবেন পুরুষ নারীর চেয়ে শক্তিশালী, সভ্যতার বিকাশে কেবল পুরুষের অবদান রয়েছে। অথচ নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। সভ্যতার আদিতে কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছে নারী। পুরুষ বাইরের কাজ করলে ঘরের কাজ করেছে নারী। বর্তমানে নারী-পুরুষ উভয়েই ঘরে-বাইরে সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে। তবুও নারীদের আমরা পুরুষের সমান মর্যাদা দিতে চাই না। আমরা ভুলে যাই যে, নারী ও পুরুষ একই বৃন্তের দুটি ফুল। একটি ছাড়া আরেকটি অচল। নারীর অবদান ও মর্যাদাকে অস্বীকার করা অন্যায়। আমাদের উচিত নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়া এবং একসঙ্গে কাজ করা। এভাবেই দেশ ও জাতির প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হবে।

এই পৃথিবীর উন্নতির পিছনে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান। তাই নারীকেও পুরুষের সমান মর্যাদার আসনে বসাতে হবে।

৪. নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

ভাবসম্প্রসারণ : মাতৃভাষার চেয়ে মধুর ভাষা পৃথিবীতে আর নেই। মায়ের ভাষায় যত সহজে ও সাবলীলভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, অন্য ভাষায় তা সম্ভব নয়।

প্রতিটি মানুষই মাতৃভাষায় কথা বলতে আনন্দবোধ করে। স্বদেশি ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলে মনের পিপাসা ততটা মেটে না। জীবনের প্রয়োজনে মানুষকে বিদেশি ভাষা শিখতে হয়। কিন্তু বিদেশি ভাষায় মনের সকল ভাব প্রকাশ করা অসম্ভব। মনের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য তাকে বারবার মাতৃভাষার কাছে ফিরে আসতে হয়। মানুষ তার মাতৃভাষায় চিন্তা করে, স্বপ্ন দেখে। অন্য ভাষা যতই মর্যাদাশীল হোক না কেন, মাতৃভাষার সঙ্গে তার কিছুতেই তুলনা চলে না। বাংলা ভাষার শক্তিমান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম জীবনে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ভুল বুঝতে পেরে তিনি মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন, মাতৃভাষাতেই তা বলতে পেরেছেন।

মাতৃভাষাকে ভালোবাসা আমাদের সকলের দায়িত্ব। অন্যথায় আমরা আমাদের পরিচয় হারিয়ে ফেলব। ভাষা ধ্বংস হলে একটি জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। তাই বাঙালি জাতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে মাতৃভাষা বাংলাকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে।

অনুশীলনী

১। ভাবসম্প্রসারণ কর :

ক) কর্ম মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

খ) চকচক করলেই সোনা হয় না।

৪. পত্র রচনা

আমাদের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম পত্র বা চিঠি। দূরের মানুষের সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে সহজে ও স্বল্প খরচে মনের ভাব আদান-প্রদান করা যায়। বড়দের মতো ছোটরাও পত্র লিখতে পারে। পত্রের মাধ্যমে বন্ধুদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। তা ছাড়া বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কারণে প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদনপত্র লিখতে হয়। এজন্য চিঠিপত্র লেখার নিয়মকানুন জানা দরকার।

পত্র লেখার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। আমাদের সেসব নিয়ম জানতে হবে। সচরাচর যেসব পত্র লিখতে হয় সেগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়– (ক) ব্যক্তিগত পত্র ও (খ) আবেদনপত্র বা দরখাস্ত। নিচে এগুলোর পরিচয় দেওয়া হলো।

ক) **ব্যক্তিগত পত্র :** মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধবকে ব্যক্তিগত দরকারে যেসব পত্র লেখা হয়, সেগুলো ব্যক্তিগত পত্র।

খ) **আবেদনপত্র বা দরখাস্ত :** বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে কিংবা বিশেষ প্রয়োজনে সরকারের বিভিন্ন অফিস ও সংস্থা অথবা বেসরকারি কোনো সংস্থার কর্মকর্তাদের নিকট যেসব পত্র লেখা হয় সেগুলোকে আবেদনপত্র বা দরখাস্ত বলা হয়।

ব্যক্তিগত পত্র লেখার নিয়ম :

এজাতীয় পত্রের দুটো অংশ থাকে — (ক) বাইরের অংশ বা শিরোনাম ও (খ) ভেতরের অংশ বা পত্রগর্ভ।

ক) **শিরোনাম :** পত্রের খাম বা পোস্টকার্ডে প্রেরক (যিনি চিঠি লেখেন) ও প্রাপকের (যাঁর উদ্দেশে চিঠি লেখা হয়) তাঁর নাম ও ঠিকানা লেখা হয়। একে শিরোনাম বলে। পোস্টকার্ড বা খামের বাম দিকে থাকে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা আর ডানদিকে থাকে প্রাপকের নাম ও ঠিকানা।
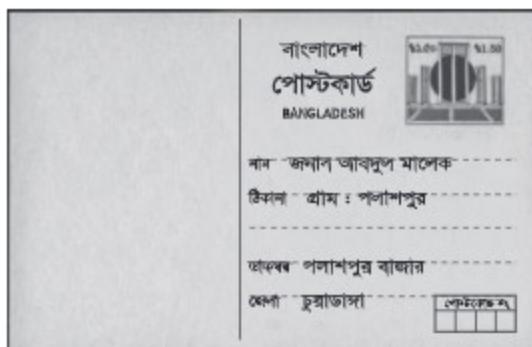
বাংলাদেশ পোস্টকার্ড
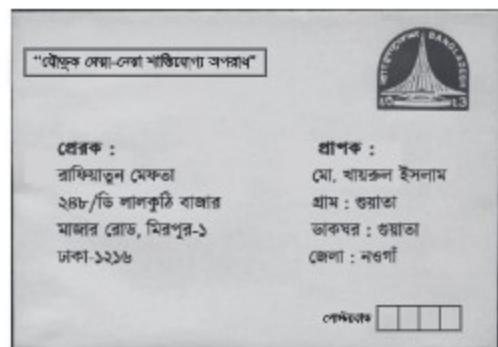
বাংলাদেশ খাম

খ) **পত্রগর্ভ :** একটি পত্রের বিষয় অনুসারে কয়েকটি ভাগ থাকে। যেমন–

১. পত্রের উপরের ডানদিকে প্রেরকের ঠিকানা লিখতে হয়। ঠিকানার নিচে পত্র লেখার তারিখ লিখতে হয়।

২. পত্রের বাম দিকে প্রাপকের প্রতি সম্ভাষণ থাকে। বয়স ও সম্পর্ক অনুযায়ী সম্ভাষণের ভাষায় পার্থক্য থাকে। গুরুজনদের উদ্দেশে শ্রদ্ধেয়, শ্রদ্ধাভাজনীয়াসু ইত্যাদি লেখা হয়। সমবয়সী বন্ধুদের প্রতি প্রিয়, প্রীতিভাজনেষু, প্রীতিভাজনাসু, বন্ধুবরেষু ইত্যাদি লেখা হয়।

৩. এরপর আসে পত্রের মূল বক্তব্য। এ-অংশে বক্তব্য অনুযায়ী কয়েকটি অনুচ্ছেদে পত্রটিকে বিভক্ত করতে হয়। বক্তব্যের শুরুতে কুশল জিজ্ঞাসা এবং শেষে সুস্বাস্থ্য কামনা করতে হয়।

৪। বক্তব্যের শেষে সমাপ্তিসূচক শব্দ, যেমন– ইতি, শুভেচ্ছান্তে, সালামান্তে ইত্যাদি লিখতে হয়। তারপর পত্র প্রেরকের নাম লিখতে হয়। অনেকে পত্রের উপরে, ঠিক মাঝখানে মঙ্গলসূচক বাক্য লিখে থাকেন। এতে পত্রলেখকের ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। যেমন– এলাহি ভরসা, ৭৮৬, শ্রীহরি শরণম্, ওঁ ইত্যাদি।

৪.১ ব্যক্তিগত পত্র

১) পরীক্ষার ফলাফলের সংবাদ জানিয়ে বাবার কাছে একখানা পত্র লেখ।

ঢাকা
জানুয়ারি ১৫, ২০১৮

শ্রদ্ধেয় বাবা,

সালাম নিন। আশা করি ভালো আছেন। গতকাল আপনার চিঠি পেলাম। আপনার আসতে দেরি হবে জেনে মনটা বেশ খারাপ হলো।

আজ আমার বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। আমার ফল জেনে আশা করি আপনি খুশি হবেন। এবারও আমি আমার জায়গাটি ধরে রাখতে পেরেছি। আমি A^+ পেয়েছি। দোয়া করবেন, আমি যেন আপনার মুখ উজ্জ্বল করতে পারি।

আপনাকে অনেক দিন দেখিনি। আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। ছুটি নিয়ে এক দিনের জন্য হলেও আমাদের সঙ্গে দেখা করে যান। আমরা আপনার আগমনের অপেক্ষায় রইলাম।

বাড়ির সবাই ভালো আছেন। আপনি শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। ভালো থাকবেন।

ইতি
আপনার স্নেহের
অর্ক।

ডাকটিকিট

প্রেরক	প্রাপক
অর্ক হাসান	মোঃ মাহফুজ হাসান
২/৩ ইকবাল রোড	থানা পাড়া, আগৈলঝাড়া
মোহাম্মদপুর	বরিশাল।
ঢাকা ১২০৭।	

২। তোমার বোনের বিয়ে উপলক্ষে বন্ধুর কাছে আমন্ত্রণপত্র লেখ।

রাজশাহী
ডিসেম্বর ১৫, ২০১৭

প্রিয় অরিক,

আমার ভালোবাসা নিও। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ। শুনে খুশি হবে, আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ আমার বড় বোনের বিয়ে। বিয়েতে অনেক ধুমধাম হবে। তোমার কথা বার বার মনে পড়ছে। তুমি এলে খুব মজা হবে।

বাবা- মাসহ বাড়ির সবাই তোমাকে ভীষণভাবে মনে করেন। বিয়ের অন্তত এক সপ্তাহ আগে তুমি আমাদের বাড়ি চলে আসবে। তুমি না এলে বিয়ের মজাই পাওয়া যাবে না। শুধু তমি নও, তোমাদের বাড়ির সবাইকে নিয়ে চলে আসবে। মনে থাকে যেন।

বড়দের আমার সালাম দিও, ছোটদের দিও আদর।

ভালো থেকো।

ইতি
তোমার বন্ধু
শুভ।

৪.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে পত্র

১. বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে ছুটির দরখাস্ত।

ফেব্রুয়ারি ০১, ২০১৮
প্রধান শিক্ষক
তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
ঢাকা।

বিষয় : অনুপস্থিতি জনিত ছুটি মুঞ্জুরের আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় গত ২৯/০১/২০১৮ থেকে ৩১/০১/২০১৮ পর্যন্ত তিন দিন আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারিনি।
অতএব, আমাকে উক্ত তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত,
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্রী
অনন্যা সরকার
ষষ্ঠ শ্রেণি, ক শাখা
রোল নম্বর ৫

২. বিনা বেতনে পড়ার সুযোগলাভের জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন।

জানুয়ারি ২৬, ২০১৮
প্রধান শিক্ষক
বিএইচপি একাডেমি
বরিশাল।

বিষয় : বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগদান প্রসঙ্গে।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। আমার বাবা একটি বেসরকারি অফিসের স্বল্প বেতনের কর্মচারী। আমরা চার ভাইবোন। আমার বড় দুই ভাই কলেজে ও ছোট বোন স্কুলে লেখাপড়া করে। পরিবারের ভরণপোষণের পর আমাদের লেখাপাড়ার খরচ চালানো আমার বাবার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য যে, আমি কৃতিত্বের সঙ্গে পঞ্চম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমি নিয়মিত ক্লাস করি।

অতএব, আমাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে আমাকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিলে আমার পড়াশোনা নির্বিঘ্ন হবে এবং তাতে আমার পরিবারও বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

বিনীত,
মোঃ আশরাফুল ইসলাম
শ্রেণি : ষষ্ঠ
শাখা : ক
রোল নম্বর : ০৩

৩। বড় বোনের বিয়ে উপলক্ষে প্রধান শিক্ষকের কাছে অগ্রিম ছুটির আবেদন।

জানুয়ারি ২৫, ২০১৮
প্রধান শিক্ষক
ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

বিষয় : বড় বোনের বিয়ে উপলক্ষে অগ্রিম ছুটি মঞ্জুরের আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আগামী ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ আমার বড় বোনের বিয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। এ-কারণে আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমার পক্ষে বিদ্যালয়ে আসা সম্ভব নয়।

অতএব, আমাকে উক্ত পাঁচ দিনের ছুটি দেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত,
রুবি আক্তার
শ্রেণি : ষষ্ঠ
রোল নম্বর : ১১

অনুশীলনী

১। পত্র লেখ :

ক) বাবার কাছে টাকা চেয়ে পত্র লেখ।
খ) দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি লেখ।

৫. অনুচ্ছেদ রচনা

বাক্য মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু সব সময় একটি বাক্যের মাধ্যমে মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। প্রয়োজন হয় একাধিক বাক্যের। মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বাক্যের সমষ্টিই অনুচ্ছেদ।

অনুচ্ছেদ এবং প্রবন্ধ এক বিষয় নয়। কোনো বিষয়ের সকল দিক আলোচনা করতে হয় প্রবন্ধে। কোনো বিষয়ের একটি দিকের আলোচনা করা হয় এবং একটিমাত্র ভাব প্রকাশ পায় অনুচ্ছেদে। অনুচ্ছেদ রচনার কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। যেমন–

ক) একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটিমাত্র ভাব প্রকাশ করতে হবে। অতিরিক্ত কোনো কথা লেখা যাবে না।
খ) সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো বাক্যের মাধ্যমে বিষয় ও ভাব প্রকাশ করতে হবে।
গ) অনুচ্ছেদটি খুব বেশি বড় করা যাবে না।
ঘ) একই কথার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
ঙ) যে বিষয়ে অনুচ্ছেদটি রচনা করা হবে, তার গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সহজ-সরল ভাষায় সুন্দরভাবে তুলে ধরতে হবে।

৫.১ ছবি আঁকা

মানুষ ভাবতে ভালোবাসে। মানুষের মনে যেসব ভাবনা খেলা করে সেসবের শিল্পময় প্রকাশই ছবি। কে কখন ছবি আঁকা শুরু করেছিল তা বলা মুশকিল। তবে মানুষের আঁকা সবচেয়ে পুরোনো ছবির কথা জানা যায়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে আলতামিরা নামক এক গুহায় প্রথম মানুষের আঁকা ছবির সন্ধান মেলে। যেকোনো মানুষই ছবি আঁকে। এমন কোনো মানুষ নেই যে জীবনে কোনোদিন ছবি আঁকেনি। যে-কোনো ছবি, হতে পারে তা কোনো পশু, পাখি, মাছ, আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে– এর কোনো-না-কোনোটি মানুষ জীবনে একবার হলেও এঁকেছে। আঁকতে আঁকতে অনেকের ছবি আঁকাটাই নেশা হয়ে যায় এবং জীবনে ছবি আঁকা ছাড়া তারা আর কিছু ভাবতে পারে না। ছবি আঁকা নিয়েই তাদের স্বপ্ন, ছবি-আঁকাই তাদের পেশা হয়ে যায়। তারা নিজেদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটায় ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে। পৃথিবীতে অনেকে বিখ্যাত হয়েছেন শুধু ছবি এঁকে।

৫.২ ফেরিওয়ালা

রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে নানা ধরনের সামগ্রী বিক্রি করে বা ফেরি করে যে জীবিকা নির্বাহ করে, সে-ই ফেরিওয়ালা। ফেরিওয়ালা আমাদের নিত্যদিনের পরিচিত ব্যক্তি। প্রতিদিনই আমরা দেখি তারা মহল্লায় মহল্লায়, রাস্তায় রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের জিনিস, মাছ, তরকারি, ফল, খাবার, কাপড়চোপড় বিক্রি করে। তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আমাদের বাসার সামনে হাজির হয়। বাজারের চেয়ে কম দামে তাদের কাছ থেকে এসব কেনা যায়। অনেক সময় নানা ধরনের গান গেয়ে তারা ক্রেতার মন জয় করার চেষ্টা করে। অনেক ফেরিওয়ালা আবার চুড়ি, ফিতাসহ নানা ধরনের খেলনা বিক্রি করে। যাওয়া-আসার মধ্য দিয়ে অনেক ফেরিওয়ালা অনেক পরিবারের সঙ্গে আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা আমাদের চাহিদা মতো অনেক জিনিস দূরের শহর থেকেও এনে দেয়। এভাবে তারা আমাদের সময় ও শ্রম বাঁচায়।

সমাজে যে যে-কাজই করুক না কেন, কোনো কাজকে ছোট করে দেখার কোনো কারণ নেই। সকল কাজই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ফেরিওয়ালাদের সম্মান দেখানো আমাদের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব।

৫.৩ শীতের পিঠা

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। শীতকাল তার মধ্যে অন্যতম। শীতকালে নতুন ধান ওঠে। সেই ধানে ঘরে ঘরে পিঠা বানানোর উৎসব শুরু হয়। নতুন চালের গুড়ো আর খেজুর রসের গুড় দিয়ে বানানো হয় নানা রকম পিঠা। নানান তাদের নাম, নানান তাদের রূপের বাহার। ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, পুলি পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, আরও হরেক রকম পিঠা তৈরি হয় বাংলার ঘরে-ঘরে। পায়েস, ক্ষীর ইত্যাদি মুখরোচক খাবার আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করে শীতকালে। এ-সময় শহর থেকে অনেকে গ্রামে যায় পিঠা খেতে। তখন গ্রামাঞ্চলের বাড়িগুলো নতুন অতিথিদের আগমনে মুখরিত হয়ে ওঠে। শীতের সকালে চুলোর পাশে বসে গরম গরম ভাপা পিঠা খাওয়ার মজাই আলাদা। গ্রামের মতো শহরে শীতের পিঠা সেরকম তৈরি হয় না। তবে শহরের রাস্তাঘাটে শীতকালে ভাপা ও চিতই পিঠা বানিয়ে বিক্রি করা হয়। এ ছাড়া অনেক বড় বড় হোটেলে পিঠা উৎসব হয়। শীতের পিঠা বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান।

৫.৪ সকালবেলা

সকালবেলা আমার খুবই প্রিয় একটা সময়। আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে আমার বাড়ির পাশে নদীর তীরে হাঁটতে যাই। সেখান থেকে সকালের সূর্যোদয় খুবই সুন্দর লাগে। সকালের শীতল বাতাস আমার দেহমন জুড়িয়ে দেয়। নানারকম পাখির কলকাকলিতে পরিবেশটা মুখরিত হয়ে ওঠে। এ-সময় কৃষকেরা গরু নিয়ে হাল চাষ করতে বের হয়। গ্রামের মসজিদে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সমস্বরে কোরান তেলাওয়াত করে। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আমি বাড়ি ফিরে নাস্তা করে পড়তে বসি। তারপর বন্ধুদের সাথে মিলে স্কুলে যাই। ছুটির দিনে সকালবেলা আমি বাবাকে নানা কাজে সাহায্য করি। সকাল-বেলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলে আমার সারাটা দিন খুব ভালো কাটে।

৫.৫ ঘরের সামনের রাস্তা

আমার ঘরের সামনে একটি পায়ে-হাঁটা রাস্তা আছে। ঘর থেকেই রাস্তাটি দেখা যায়। রাস্তাটি শুরু হয়েছে পাশের গ্রাম থেকে। একটি বড় রাস্তার সঙ্গে গিয়ে এটি মিশেছে। সারাদিনই এ-রাস্তা দিয়ে মানুষ যাওয়া-আসা করে। কত রকমের মানুষ যে এ-রাস্তা দিয়ে চলাচল করে তার হিসেব নেই। অফিসের কর্মচারী, কৃষক, ছাত্রছাত্রী, দিনমজুর, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি পেশার মানুষ সকালবেলা তাদের কর্মক্ষেত্রে যায় এ-রাস্তা দিয়ে। কাজশেষে বিকেলে আবার ফিরে আসে তাদের বাড়িতে। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি সবার আনাগোনা। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা– একেক ঋতুতে রাস্তাটি একেক রূপ ধারণ করে। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আলোয় রাস্তাটি অপরূপ লাগে। তখন মনে হয় রাস্তাটি যেন চলে গেছে কোন অজানা দেশে। আমার জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে এ-রাস্তা।

অনুশীলনী

১। অনুচ্ছেদ লেখ :

ক) একটি পুরোনো বটগাছ

খ) স্কুল লাইব্রেরি।

৬. প্রবন্ধ রচনা

প্রবন্ধ হলো প্রকৃষ্টরূপে বন্ধনযুক্ত রচনা। অর্থাৎ অন্যান্য রচনা, যেমন– কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির সঙ্গে প্রবন্ধ লেখার রীতি ও কৌশলের পার্থক্য রয়েছে। কবির একান্ত অনুভূতিই কবিতায় প্রকাশ পায়। গল্প হলো মানবজীবনের নির্বাচিত ঘটনার আখ্যান বা কাহিনি। উপন্যাসের পরিসর বড়। সেখানে লেখক গল্পকারের তুলনায় বেশি স্বাধীন। উপন্যাসে সমগ্র জীবন ফুটে ওঠে। নাটকে কেবলই থাকে সংলাপ। বিবরণ বা বর্ণনার সেখানে তেমন স্থান নেই। কিন্তু প্রবন্ধকে হতে হয় যুক্তি ও তথ্যনির্ভর। কাদের জন্য প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে সেটা মনে রাখতে হয়। কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে তাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধ-রচয়িতার মেধা, জ্ঞান, প্রকাশক্ষমতা প্রবন্ধের গুণগত মান বাড়িয়ে দেয়। প্রবন্ধের ভাষা স্থির করা হয় প্রবন্ধের বিষয় অনুসারে। বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে গেলে তাতে বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে। সকল বয়সের পাঠকের জন্য একই ভাষায় প্রবন্ধ লেখা যায় না। শিশুরা যে-ভাষা বুঝবে, তাদের জন্য প্রবন্ধ সেভাবে লিখতে হবে। বিষয় অনুসারে প্রবন্ধের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। বিজ্ঞানের বিষয়কে আশ্রয় করে রচিত প্রবন্ধকে আমরা বলি **বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ**। সমাজের সমস্যা, সংকট, অবস্থা যেসব প্রবন্ধের মূল বিষয়, সেগুলোকে বলা হয় **সামাজিক প্রবন্ধ**। সাহিত্যকর্মের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে যেসব প্রবন্ধ রচিত হয়, সেগুলোকে বলে **সমালোচনামূলক প্রবন্ধ**। লেখকের অনুভূতিই যখন প্রবন্ধের আকারে তুলে ধরা হয়, তখন তাকে বলে **অনুভূতিনির্ভর প্রবন্ধ**। এ ছাড়াও প্রবন্ধের আরও শ্রেণি নির্দেশ করা যায়।

প্রবন্ধ-রচনার কৌশল

প্রবন্ধের প্রধানত তিনটি অংশ থাকে– (ক) ভূমিকা (খ) মূল অংশ (গ) উপসংহার।

ক) **ভূমিকা :** যে-বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা হয় সে-বিষয়ে শুরুতেই সংক্ষেপে প্রথম অনুচ্ছেদে একটি ধারণা দেওয়া হয়। এটিই হলো ভূমিকা। এ-অংশ হতে হবে বিষয় অনুযায়ী, আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত।

খ) **মূল অংশ :** প্রবন্ধের মধ্যভাগ হলো মূল অংশ। এখানে প্রবন্ধের মূল বক্তব্য পরিবেশিত হয়। বিষয় অনুসারে এ অংশ বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভক্ত হতে পারে। প্রতিটি অনুচ্ছেদ যেন মূল প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এ-অংশে কোনো উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হলে তা যাতে কোনোভাবেই বিকৃত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ মূল রচনায়, যেভাবে আছে সেভাবেই তা ব্যবহার করতে হবে।

গ) **উপসংহার :** অল্প কথায় সমাপ্তিসূচক ভাব প্রকাশ করাই উপসংহার। ব্যক্তিগত মত, সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশা এ-অংশে প্রকাশ করা যেতে পারে।

প্রবন্ধ-রচনায় দক্ষতা অর্জনের উপায়

প্রবন্ধ-রচনায় দক্ষতা অর্জন একদিনে হয় না। কিন্তু তা সাধ্যের অতীত কোনো বিষয় নয়। এজন্য করণীয় হলো–

১. প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা।

২. দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রবন্ধ পড়া। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, সংবাদ, প্রতিবেদন, ভাষণ ইত্যাদি নিয়মিত পাঠ করলে নানা প্রসঙ্গে বিষয়গত ধারণা লাভ করা যায়।

৩. প্রবন্ধের বক্তব্য তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তুলে ধরতে হবে।
৪. প্রবন্ধ-রচনার ভাষা হবে সহজ ও সরল।
৫. প্রবন্ধে কোনো অপ্রয়োজনীয় বিষয় থাকবে না এবং একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটানো যাবে না।
৬. প্রবন্ধে উদ্ধৃতি, উক্তি বা প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু এসবের ব্যবহার যেন অতিরিক্ত পর্যায়ে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৭. প্রবন্ধ যাতে অতিরিক্ত দীর্ঘ না হয় তা লক্ষ করতে হবে।

৬.১ আমাদের বিদ্যালয়

ভূমিকা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর শিক্ষালাভের জন্য চাই আদর্শ বিদ্যাপীঠ। এক সময় শিক্ষা ছিল আশ্রমকেন্দ্রিক। শিক্ষার্থী সেই সময় আশ্রমে থেকেই গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করত। আদর্শ বিদ্যালয় এক-একটি আশ্রমবিশেষ। এমনই একটি আশ্রম আমার বিদ্যালয়। এ-বিদ্যালয়ের নাম স্বপ্নিল উচ্চ–মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

প্রতিষ্ঠা

স্বপ্নিল উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এ-বিদ্যালয়ে পাঠদান করা হয়। বিদ্যালয়টি ঢাকা বোর্ডের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে বেশ কয়েক বার স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আমাদের বিদ্যালয়

অবস্থান

ঢাকা মহানগরীর কেন্দ্রবিন্দুতে, জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম পাশে মনোরম পরিবেশে আমাদের বিদ্যালয় অবস্থিত। এর উত্তর পাশে একটি ব্যস্ত রাস্তা। বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার জন্য ভালো ব্যবস্থা রয়েছে। মহানগরীর যেকোনো এলাকা থেকে বিদ্যালয়ে সহজেই আসা যায়।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছ রয়েছে। বিশাল প্রাঙ্গণে দুটি দীর্ঘকায় চারতলা ভবন। তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত তিনটি করে শাখা এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে সাতটি করে শাখা রয়েছে। প্রতি শাখার জন্যই রয়েছে আলাদা ও পরিপাটি শ্রেণিকক্ষ। অধ্যক্ষ ও দুজন উপাধ্যক্ষের নিজস্ব মনোরম কক্ষ রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত একটি বড় অফিসরুম আছে। নব্বই জন শিক্ষকের জন্য রয়েছে তিনটি সুন্দর কক্ষ। একটি বড় পাঠাগার আছে। সেখানে বিভিন্ন ধরনের বই রয়েছে। বিদ্যালয় ভবনের সামনে আছে বিশাল মাঠ।

শিক্ষার্থী

আমাদের বিদ্যালয়ে প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি করে শাখা। প্রতি শাখায় পঞ্চান্ন জন করে শিক্ষার্থী। তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থীসংখ্যা তেরশো পঞ্চাশ এবং কলেজ শাখার শিক্ষার্থীসংখ্যা এক হাজার চারশো। সকালে সব শিক্ষার্থী যখন জাতীয় সংগীত পরিবেশনের জন্য একসঙ্গে দাঁড়াই, তখন মনে হয় এ যেন শিক্ষার্থীদের এক বিশাল মিলনমেলা।

শিক্ষক

আমাদের অধ্যক্ষ একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। আমাদের দুজন উপাধ্যক্ষ আছেন। প্রিয় শিক্ষকবৃন্দ আমাদের সন্তানের মতো স্নেহ করেন এবং আলোকিত মানুষ হবার শিক্ষা দেন। আমরা তাঁদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি।

লেখাপড়ার পদ্ধতি

সপ্তায় ছয় দিন আমাদের বিদ্যালয় খোলা থাকে। শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। প্রতিদিন আমাদের ছয়টি ক্লাস হয়। প্রতি সপ্তাহে রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার, আগের সপ্তাহে পড়ানো হয়েছে এমন সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এ ছাড়াও বছরে তিনটি পরীক্ষা হয়। সাপ্তাহিক ও টেস্টের ৪০% এবং ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফল তৈরি করা হয়। পরীক্ষার কারণে আমাদের পড়ালেখার টেবিল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপায় থাকে না।

গবেষণাগার

বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞান গবেষণাগার এবং কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে।

পাঠ্যক্রম-অতিরিক্ত বিষয়ের চর্চা

আমাদের বিদ্যালয়ে কতগুলো ক্লাব আছে। যেমন– নাট্যদল, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিতর্ক ক্লাব, দাবা ক্লাব, সায়েন্স ক্লাব, সংগীতদল, পাঠচক্র ও শরীরচর্চা ক্লাব।

অনুষ্ঠানাদি

ক্লাবগুলো সারা বছর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আয়োজন করে থাকে। এসব অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ আসেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ যেমন আমরা পাই, তেমনি তাঁদের কাছ থেকে নতুন নতুন তথ্য জানতে পারি।

খেলাধুলা

আমাদের বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি অনেক বড়। মাঠে নিয়মিত খেলাধুলা হয়। প্রতিদিন বিকেলে মৌসুম অনুযায়ী ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল ও ব্যাডমিন্টন খেলা হয়। আমাদের বিদ্যালয়ে ফুটবল, ক্রিকেট ও বাস্কেটবল টিম আছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আমরা অনেক পুরস্কার অর্জন করেছি।

পরীক্ষার ফল

প্রতিবছরই আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জন করে। পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল সবার দৃষ্টি কাড়ে। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের বিদ্যালয় প্রতিবছরই সেরা দশে থাকে।

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

পরীক্ষার ভালো ফল এবং ক্লাবের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য আমাদের বিদ্যালয়ের সুনাম রয়েছে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি ও নিয়ম-শৃঙ্খলা অন্য সব প্রতিষ্ঠান থেকে উন্নত।

উপসংহার

একটি আদর্শ বিদ্যালয় বলতে যা বোঝায়, আমাদের বিদ্যালয় তা-ই। মনোরম পরিবেশ, জ্ঞানী-গুণী শিক্ষক আর সেরা ফলাফলের জন্য আমাদের বিদ্যালয় অতুলনীয়। এ-প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষার্থী হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। আমাদের বিদ্যালয় সব সময় দেশের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হোক– এই আমার প্রত্যাশা।

৬.৩ আমার প্রিয় খেলা

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বের জনপ্রিয় ও অভিজাত খেলা ক্রিকেট। ক্রিকেটকে খেলার রাজাও বলা হয়। রেকর্ড ভাঙা এবং রেকর্ড গড়ার খেলা ক্রিকেট। ক্রিকেট নিয়ে সমগ্র বিশ্বে এখন উত্তেজনা। ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা প্রতিদিন বাড়ছে। আমার প্রিয় খেলা ক্রিকেট।

ক্রিকেট খেলার একটি দৃশ্য

ক্রিকেটের জন্ম

কবে প্রথম ক্রিকেট খেলা শুরু হয়,তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে মনে করা হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইংল্যান্ডে ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়। হ্যাম্পসায়ারের অন্তর্গত হ্যাম্পারডন নামক স্থানে প্রথম ক্রিকেট দল গড়ে ওঠে। পরে তা সমগ্র ব্রিটেন এবং সকল ব্রিটিশ উপনিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশসহ অনেক দেশে ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

প্রকারভেদ

ক্রিকেট খেলা দু-ধরনের। একটি হলো ওয়ান ডে ম্যাচ বা এক দিনের খেলা, অন্যটি টেস্ট ম্যাচ বা পাঁচ দিনের খেলা। এখন আবার শুরু হয়েছে টুয়েন্টি টুয়েন্টি ম্যাচ। বিশ্বে বিখ্যাত টেস্ট মর্যাদা প্রাপ্ত দেশগুলো হলো ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে ও বাংলাদেশ।

উপকরণ

ক্রিকেট খেলার মুখ্য উপকরণ কাঠের ব্যাট ও বল। ব্যাট দৈর্ঘ্যে আড়াই ফুট ও প্রস্থে সাড়ে চার ইঞ্চি হয়। এ খেলায় প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট চামড়ায় মোড়ানো কাঠের বল ব্যবহার করা হয়। খেলার জন্য কাঠের তৈরি তিনটি দণ্ড প্রয়োজন হয়। এগুলোকে উইকেট বলে। বিপরীত দিকে একইভাবে আরও তিনটি উইকেট থাকে। উইকেটের মধ্যে ব্যবধান সমান রাখার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট মাপের দু-টুকরো কাঠ উইকেটের উপর বসানো হয়। একে বেল বলে। এ ছাড়া পায়ে পরার জন্য তুলার তৈরি এক প্রকার পুরু প্যাড ও হাতে পরার জন্য গ্ল্যাভস বা হাতমোজা প্রয়োজন পড়ে।

মাঠের আকৃতি

ক্রিকেট মাঠ বৃত্তাকার। সাধারণত এর ব্যাসার্ধ হয় ৭০ গজ। মাঠের মাঝখানে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয় পিচ। পিচের দৈর্ঘ্য হয় ২২ গজ।

নিয়ম-কানুন

দুটি দলের মধ্যে ক্রিকেট খেলা হয়। প্রতি দলে এগারো জন করে খেলোয়াড় থাকে। ক্রিকেট খেলা পরিচালনার জন্য দুইজন আম্পায়ার থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে তৃতীয় আম্পায়ার দেখা যায়।

খেলা আরম্ভের পূর্বে দুজন আম্পায়ার এবং দু-দলের দুজন অধিনায়ক মাঠে নামেন। মুদ্রা ছুড়ে দিয়ে টসের মাধ্যমে এক দল জয়ী হয়। টসে জয়লাভকারী অধিনায়ক ইচ্ছে করলে ব্যাটিং বা ফিল্ডিং যেকোনোটি বেছে নিতে পারেন। উভয় দলকে একবার করে ব্যাট করতে হয়। ফিল্ডিংকারী দলের সমস্ত খেলোয়াড় মাঠের ভেতর অধিনায়কের নির্দেশ মেনে তাদের নিজস্ব স্থানে অবস্থান করেন। যে-দল প্রথম ব্যাটিং করবে, সে দলের দুজন খেলোয়াড় ব্যাট হাতে দু উইকেটে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁদের মধ্যে একজন বল পেটান, অপরজন প্রয়োজনবোধে রান সংগ্রহ করার জন্য দৌড়ান। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা ব্যাটসম্যানদের আউট করার চেষ্টা করেন। বল নিক্ষেপকারীকে বোলার বলে। একজন বোলার পরপর ছটি বল করতে পারেন। ছটি বলে এক ওভার ধরা হয়। ব্যাটসম্যান অতি সতর্কতার সাথে বল মারেন। সুযোগমতো বল ব্যাটের আঘাতে দূরে পাঠান।

ব্যাটসম্যান যখন বল দূরে পাঠান, তখন অপর দিকের উইকেটে অপেক্ষমাণ খেলোয়াড় ও ব্যাটসম্যান একে অন্যের পাশে দৌড়ে এলে এক রান হয়। বল গড়িয়ে সীমারেখা পার হলে চার রান হয়। আর বল না গড়িয়ে মাঠের উপর দিয়ে সীমানা অতিক্রম করলে ছয় রান হয়।

বল যদি উইকেটে লাগে, তাহলে ব্যাটসম্যান আউট হন। একে বোল্ড আউট বলে। ব্যাট দিয়ে আঘাত করার পর তা মাটিতে পড়ার আগেই বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় ধরে ফেললে ব্যাটসম্যান আউট হন। একে কট আউট বলে। এ ছাড়া ব্যাটসম্যান রান আউট বা স্টাম্প আউটও হতে পারেন। এক দলের সবাই আউট হয়ে গেলে বা নির্ধারিত ওভার শেষ হয়ে গেলে অন্য দল ব্যাটিং করতে নামে।

ক্রিকেট খেলার জয়পরাজয় নির্ধারিত হয় রানের সংখ্যা বা নির্দিষ্ট সময়ে কতজন ব্যাটসম্যান নট আউট থেকে যায়, তা হিসেব করে। এ-খেলায় যে-দল রান, ওভার, সময় ও উইকেটরক্ষায় সক্ষম হয়, সে-দলই জয়লাভ করে।

ক্রিকেট খেলার আনন্দ

ক্রিকেট খেলার চমক ভিন্ন মাত্রার। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সাজানোর মতো মাঠে ফিল্ডার সাজানো খুবই কৌশলের ব্যাপার। ক্রিকেটের উত্তেজনা বেড়ে যায় যখন, ব্যাটসম্যানের নৈপুণ্যে সেই ব্যূহ তছনছ হয়ে যায় ছক্কা ও চারের মারে। ছক্কা ও চারের মারে রান তোলার উত্তেজনাই আলাদা। বোলিংয়ের দাপট বা ফিল্ডারদের হাতে ব্যাটিং-বিপর্যয় এই উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনাকে চরমে পৌঁছে দেয়। একদিনের ক্রিকেটের উত্তেজনা আলাদা। বর্তমানে টি-টুয়েন্টি (২০ ওভার) ম্যাচ সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ খেলা হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

উপকারিতা

অন্যান্য খেলার মতো ক্রিকেট খেলা ও আনন্দদায়ক ও স্বাস্থ্যকর। এ-খেলা একাধারে খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলাবোধ, পারস্পরিক সমঝোতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দায়িত্বজ্ঞান ও সতর্কতার শিক্ষা দেয়। আন্তর্জাতিক

ক্রিকেট খেলার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। দেশের ক্রীড়াদলকে শুভেচ্ছাদূত বলে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ এ-খেলায় পারদর্শী হয়ে উঠছেন। বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

সতর্কতা

ক্রিকেট খেলায় যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। কাঠের বল বেশ শক্ত। বোলারের সজোরে নিক্ষেপ করা বল কোনো খেলোয়াড়ের শরীরে লাগলে সে মারাত্মকভাবে আহত হতে পারে, মাথায় লাগলে অনেক সময় মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়। তাই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে ক্রিকেট খেলা উচিত। ক্রিকেট খেলা অত্যন্ত সময়হরণকারী, এতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়। তা ছাড়া ক্রিকেট বেশ ব্যয়বহুল খেলা। সবকিছুরই ভালো-মন্দ দুটি দিক থাকে। ক্রিকেটের ভালো দিকই বেশি। মন্দ যে দিকগুলোর কথা বলা হলো, সেদিকে আমরা সচেতন থাকব।

উপসংহার

আধুনিক যুগে যত খেলা রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিকেট। ক্রিকেট খেলা যেমন আনন্দদায়ক, তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ। সময় ও অর্থের অধিক ব্যয়ের কারণে অনেক সমালোচক একে অপচয় বলে মনে করেন। তবু বিশ্ব আজ ক্রিকেটজ্বরে আক্রান্ত। এর জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া।

৬.৪ বর্ষাকাল

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ঋতুগুলোর মধ্যে বর্ষাকাল একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল। তবে ভাদ্র মাসের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে বর্ষা থাকে।

গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে প্রকৃতি যখন জ্বলেপুড়ে যেতে থাকে, তখন শান্তির পরশ নিয়ে আসে বর্ষাকাল। দিনরাত অবিরাম বৃষ্টির ধারা প্রকৃতিকে করে তোলে শান্ত ও মনোরম। আকাশে সারাদিন চলে মেঘ ও সূর্যের লুকোচুরি খেলা। মেঘের গুড়ুগুড়ু ধ্বনি মনকে দোলায়িত করে। আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের চমকে শিহরিত হয় শরীর ও মন। বৃষ্টির পানিতে নদী-নালা-খাল-বিল টইটম্বুর হয়ে যায়। নতুন পানি পেয়ে ব্যাঙ ডাকতে থাকে– ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। তখন সবার মন কেমন উদাস হয়ে যায়।

বর্ষাকালের একটি দৃশ্য

বর্ষাকালে প্রকৃতি নবজীবন লাভ করে। গাছপালার রং গাঢ় সবুজ হয়ে ওঠে। প্রকৃতি শীতল হয়ে যায়। বর্ষার নতুন পানিতে মাছেরাও প্রাণ ফিরে পায়। অধিক বৃষ্টিপাত হলে রাস্তাঘাট ডুবে যায়। তখন গ্রামগুলো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো পানিতে ভেসে থাকে। নৌকা ছাড়া তখন চলাচল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বর্ষায় বৃষ্টির পানিতে কৃষিজমি নরম হয়ে যায়। এ-সময় জমি চাষ করা খুবই সহজ। কৃষকেরা মনের আনন্দে জমি চাষ করে তাতে ধান, পাট রোপণ করে। বর্ষা যত বাড়তে থাকে গ্রামের লোকের কাজ তত কমতে থাকে। এ-সময় তারা অলস জীবনযাপন করে। পুরুষেরা ঘরের দাওয়ায় বসে ঘরের টুকটাক কাজ করে, আড্ডা দেয়। মাঝে মাঝে বসে গানের আসর। মহিলারা ঘরে বসে নকশি কাঁথা সেলাই করে।

শহরে বর্ষাকাল বেশিরভাগ সময়ে ভোগান্তির সৃষ্টি করে। একটু বেশি বৃষ্টি হলেই শহরের রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে যায়। এ-সময় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে সমস্যা হয়। দিনমজুরেরা বর্ষাকালে কর্মহীন হয়ে পড়ে।

বর্ষাকালে উজান থেকে বয়ে আসা পানিতে কৃষিজমি উর্বর হয়। বর্ষার পানিতে ময়লা আবর্জনা ধুয়ে যায়। ফলে পরিবেশ-দূষণ কমে। এ-সময় নদীতে প্রচুর ইলিশ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের পানির চাহিদার ৭০ ভাগ পূরণ হয় বর্ষাকালে। নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় জলপথে যাতায়াত সহজ হয়। এ-সময় মাছেরা বংশবৃদ্ধি করে। বর্ষাকালে জাম, পেয়ারা, জামরুল, আনারস ইত্যাদি ফল পাওয়া যায়। গাছে-গাছে জুঁই, কেয়া, কদম ইত্যাদি ফুল ফোটে। তাই কবির ভাষায় বলতে হয় :

গুড়ুগুড়ু ডাকে দেয়া
ফুটিয়ে কদম-কেয়া
ময়ূর পেখম খুলে
সুখে তান ধরছে।

বর্ষাকালের যেমন উপকারিতা আছে, তেমনি ক্ষতিকর দিকও আছে। অধিক বৃষ্টিপাত ও হিমালয় থেকে আসা ঢলে অনেক সময়েই বন্যা হয়। তখন জনপদের পর জনপদ পানিতে ডুবে যায়। ভাসিয়ে নিয়ে যায় খেতের ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু। লাখ লাখ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করে। এ-সময় জ্বর, ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এতে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে। বন্যার পানিতে শহরের রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে যায়। ফলে যানবাহন প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হয়। বন্যায় কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হয়।

নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি করলেও বর্ষাকাল আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়েই আসে। কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে আমাদের অর্থনীতিতে বর্ষাকাল বিরাট অবদান রাখে। বর্ষা আছে বলেই বাংলাদেশে সবুজের এত সমারোহ। তাই বৈশাখে আমরা যেমন বর্ষবরণ করি, তেমনি বর্ষাকালে ঘটা করে বর্ষাবরণ করি। বাংলা সাহিত্যেও বর্ষাকাল বিপুলভাবে অভিনন্দিত।

৬.৫ আমার দেখা নদী

নদীর কথা উঠলে একটি নদীই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তার নাম শীতলক্ষ্যা। শীতলক্ষ্যা আমার প্রিয় নদী। আমাদের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে, ঠিক শীতলক্ষ্যা নদীর পাশেই। শীতলক্ষ্যা আমার জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। শীতলক্ষ্যা নদীর রূপ একেক ঋতুতে একেক রকম। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উত্তাপে যখন পানি শুকিয়ে যায়, তখন নদীর দুই পাশে জেগে ওঠে চর। সেখানে কৃষকেরা

শীতলক্ষ্যা নদী

আলু, মরিচ, পেঁয়াজ ইত্যাদি চাষ করে। আমরা সকালে গরু-ছাগল চরাতে নিয়ে যাই সেই চরে। দুপুরবেলা নদীতে দাপাদাপি করে গোসল করি। চরের বালিতে শুয়ে বিশ্রাম নিই, আবার ঝাঁপিয়ে পড়ি নদীতে। যারা বয়সে একটু বড়, তারা বাজি ধরে সাঁতরে নদী পার হয়। আমরা হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহ দিই। নদীর বুক চিরে যখন বড় বড় জাহাজ চলে যায়, আমরা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকি। মায়ের মুখে শুনেছি, এ-নদীতে এক সময় কুমির ছিল। কিন্তু এখন আর কুমির দেখা যায় না, তবে মাঝে মাঝে শুশুক ভেসে উঠেই আবার ডুব দেয়।

বর্ষাকালে শীতলক্ষ্যা নদী কানায় কানায় ভরে যায়। এ-সময় নদীতে প্রচণ্ড স্রোত থাকে। বড় বড় ঢেউ তীরে এসে আঘাত করে। অনেক সময় নদীর পানি বেশি বেড়ে গেলে দুই পাশের গ্রাম, ফসলের মাঠ সব ডুবে যায়। তখন আমাদেরকে হয় ঘরের চালে, অথবা নৌকায় আশ্রয় নিতে হয়। এ-সময় নদীর রূপ দেখলে আমার ভয় করে। তবে বাবা প্রায়ই ছোট ডিঙি নৌকায় চড়ে খুব সহজে চলে যায় দূরদূরান্তে। আমরা বাড়িতে ঢুকে-পড়া পানিতে সাঁতার কেটে গোসল করি।

শরৎকালে শীতলক্ষ্যা আবার অন্য রূপ ধরে। তখন নদীর দুই পাশে যত দূর চোখ যায়, কাশফুল ফুটে থাকে। কাশবনের ভেতরে অনেক পাখি বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে। আমরা বিকেল বেলা নৌকায় চড়ে নদীর বুকে নেমে পড়ি। সন্ধ্যাবেলা যখন পাখিরা বাসায় ফিরে আসে, তখন তাদের কলকাকলিতে চারপাশ মুখরিত হয়ে ওঠে। আমরা নৌকার পাটাতনে শুয়ে সন্ধ্যার আকাশ দেখি। সে এক অপরূপ দৃশ্য! রাতে কাশবনে শেয়াল ডাকে– হুক্কা হুয়া করে।

শীতকালে অনেক বেলা পর্যন্ত শীতলক্ষ্যার বুকে কুয়াশা জমে থাকে। এ-সময় নদীটাকে অনেক রহস্যময় লাগে। এ-সময় নদীতে চর জাগা শুরু হয়। আমরা খাড়ি পেরিয়ে চরে চলে যাই মাছ ধরতে। সন্ধ্যা হতে-না-হতেই নদীটি আবার কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে।

শীতলক্ষ্যা নদী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ-নদীতেই রয়েছে বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর। নদীর পাশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কলকারখানা। অনেক বড় বড় জাহাজ চলে যায় নদী দিয়ে। তবে শীতলক্ষ্যা নদী দিন দিন দূষিত হয়ে যাচ্ছে, যা আমাকে খুবই কষ্ট দেয়।

শীতলক্ষ্যাকে কেন্দ্র করেই এর দুই তীরের মানুষের জীবন গড়ে উঠেছে। আমি এই নদীকে ছাড়া একটি দিনও কল্পনা করতে পারি না। শীতলক্ষ্যা যেন আমার জীবনেরই অংশ।

৬.৬ সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। একজন সত্যবাদী মানুষ কখনো মিথ্যা বলেন না। চরম বিপদেও তিনি সত্যকে আঁকড়ে থাকেন। সত্যবাদী সমাজে ও রাষ্ট্রে আদর্শ মানুষ হিসেবে বিবেচিত। তাঁকে সবাই সম্মান করে।

সত্য কথা বলার গুণকে সত্যবাদিতা বলে। সত্যবাদিতা মানুষের চরিত্রের অলংকারস্বরূপ। সত্য কথা বলতে পারলে অন্যান্য গুণ মানুষের মধ্যে এমনিই চলে আসে। সত্য কথা বললে হয়তো সাময়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এর পরিণাম সবসময়ই ভালো হয়। সত্যবাদী মানুষ কখনো খারাপ কাজ করতে পারেন না। তিনি খুবই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসী হন। সবাই তাঁকে বিশ্বাস করে ও ভালোবাসে। একজন মিথ্যাবাদীও সত্যবাদীকে পছন্দ করে। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। সে সমাজে সবার কাছে হেয় হয়। কেউ তাকে সম্মান করে না। প্রবাদ আছে যে, মিথ্যাবাদীর সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো, সবাই তাকে অবিশ্বাস করে তা নয়, বরং সে-ই কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না।

ইতিহাসে যারা স্মরণীয় হয়ে, আছেন তাঁদের সবাই ছিলেন সত্যবাদী। মহানবি হজরত মুহম্মদ (সা.) ছিলেন সত্যবাদিতার আদর্শস্বরূপ। তাঁকে সবাই আল-আমিন বা বিশ্বাসী বলে ডাকত। তাঁর শত্রুরাও তাঁকে বিশ্বাস করত। তাঁর কাছে তাদের সম্পত্তি গচ্ছিত রেখে যেত। মহাত্মা গান্ধী একদিন তাঁর বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করেন। কিন্তু পরে তিনি অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়ে বাবাকে তাঁর চুরির কথা বলে দেন। এতে তাঁর বাবা তাঁর উপর খুবই রাগ করেন। কিন্তু গান্ধী তাতেও সত্যের পথ থেকে সরে আসেননি। তিনি সারাজীবন যা সত্য বলে জেনেছেন, তা-ই পালন করেছেন। কখনোই মিথ্যার কাছে মাথা নত করেননি।

অল্প বয়স থেকেই সত্যবাদিতার চর্চা করতে হয়। কোনো ভুল বা দোষ করলে তা স্বীকার করার মনোবল আমাদের অর্জন করতে হবে এবং পরবর্তীতে আর তা না-করার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সত্যবাদিতার জয় সুনিশ্চিত। মিথ্যা কথা বলে অন্যায় সুবিধা পাওয়ার চেয়ে সত্য কথা বলে কষ্ট স্বীকার করা অনেক ভালো। সত্যবাদিতা শেখার প্রথম পাঠশালা হলো পরিবার। পরিবারে অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে, শিশুরা যাতে কখনো মিথ্যা কথা না শেখে। তাদের সামনে সত্যবাদিতার আদর্শ স্থাপন করতে হবে।

সত্যবাদিতা মানুষের চরিত্রকে সুন্দর ও মহৎ করে তোলে। আমাদের সবাইকে সত্যবাদিতার চর্চা করতে হবে। আমরা মনে রাখব সত্যের জয় হবেই। মিথ্যা বললে সাময়িক সুবিধা হয়তো পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার পরিণতি হয় ভয়ংকর। একজন সত্যবাদী পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ।

৬.৭ আমাদের গ্রাম

ভূমিকা

মাতৃভূমি মানুষের কাছে স্বর্গবিশেষ। আমার গ্রাম আমার কাছে স্বর্গ। আমার জন্ম গ্রামে। আমার গ্রামের চেয়ে পবিত্র আর কিছু নেই। যেখানে আমার জন্ম, সেই গ্রামের জল আমার তৃষ্ণা মিটিয়েছে, খেতের ফসল ক্ষুধা দূর করেছে, পাখির কলকাকলি আমার ঘুম ভাঙিয়েছে, মুক্ত বাতাস আমার প্রাণ জড়ানো আমার গ্রাম। কবির ভাষায় :

আমাদের গ্রামখানি ছবির মতন,
মাটির তলায় এর ছড়ানো রতন।

আমাদের গ্রামের একটি দৃশ্য

নাম ও অবস্থান

আমার গ্রামের নাম রূপনগর। গ্রামের দক্ষিণ পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট খাল। পূর্ব পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নদী; যদিও নদীটি গাঁয়ের মানুষের কাছে বড় খাল নামে পরিচিত। ফরিদপুর জেলায় ছায়াময় মায়াময় এ-গ্রাম। নদীটি পূর্ব-পশ্চিমে দু-মাইল লম্বা ও উত্তর-দক্ষিণে দেড় মাইল প্রশস্ত।

লোকসংখ্যা

আমাদের গ্রামে প্রায় তিন হাজার লোক বাস করে। এ-গ্রামে সকল ধর্মের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে। সবার মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন অটুট।

পোশাক-পরিচ্ছদ

আমাদের গ্রামের মানুষ ভালো কাপড়চোপড় পরে। পুরুষেরা লুঙ্গি, পাজামা, পাঞ্জাবি, শার্ট এবং মেয়েরা সালোয়ার, কামিজ, শাড়ি পরে।

পেশা

আমাদের গ্রামের প্রায় প্রতি বাড়িতে উচ্চশিক্ষিত লোক রয়েছে। তাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চপদে কর্মরত আছেন। বাংলাদেশের বাইরেও অনেকে কর্মরত। যাঁরা গ্রামে বসবাস করেন, তাঁদের কেউ কৃষক, কেউ-বা ব্যবসায়ী। এ ছাড়া নানান পেশার লোক রয়েছে আমাদের গ্রামে। তাঁদের মধ্যে রয়েছে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, উকিল, তাঁতি, জেলে, কামার, কুমার, সুতোর।

ঘরবাড়ি

আমাদের গ্রামের বেশির ভাগ ঘরবাড়ি টিনের তৈরি। তবে বারোটি দালানও রয়েছে। কোনো কোনো বাড়ি ছনের বা খড়ের তৈরি।

উৎপন্ন দ্রব্য

গ্রামের প্রধান ফসল ধান। আমাদের গ্রামে প্রচুর ধান হয়। এ ছাড়াও উৎপন্ন হয় পাট, গম, ডাল, সরিষা, তিল, আখ এবং নানারকম শাকসবজি। প্রচুর পরিমাণে গাভীর দুধ পাওয়া যায়। পুকুর, খাল ও নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। সব বাড়িতেই হাঁস-মুরগি পালন করা হয়। বাগানে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, নারকেল, জাম, সুপারি, তাল, বেল, হরীতকী, আমলকী ইত্যাদি পাওয়া যায়। গ্রামের মানুষের নিজেদের খাবারের জন্য যা প্রয়োজন, তার প্রায় সবই গ্রামে উৎপন্ন হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আমাদের গ্রামে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জীবনের প্রথম পাঠ শুরু করে। প্রাথমিক পাঠ শেষ করে ভর্তি হয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আমাদের

গ্রামে একটি স্বেচ্ছাসেবক নৈশ বিদ্যালয় আছে। যারা লেখাপড়া জানেন না, গ্রামের শিক্ষিত যুবকেরা তাদের সন্ধ্যার পর লেখাপড়া শেখান। আমাদের গ্রামে কোনো নিরক্ষর লোক নেই।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

আমাদের গ্রামে যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, তেমনি রয়েছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও। যেমন– পোস্ট অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, কৃষি অফিস।

হাটবাজার ও দোকানপাট

আমাদের গ্রামে একটি বড় হাট আছে। সপ্তায় দুইদিন সেখানে হাট বসে। হাটবার হলো : শনিবার ও বুধবার। হাটের দিন অনেক দূর থেকে বহু ক্রেতা-বিক্রেতা আসে। হাটে ধান, চাল, আলু, বেগুন, পটল, পাট, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি প্রায় সবধরনের জিনিসপত্র বেচাকেনা হয়। গ্রামে প্রতিদিন সকালে বাজার বসে। মাছ, দুধ, শাকসবজিসহ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিস এখানে পাওয়া যায়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

গ্রামের পূর্ব পাশ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। গ্রামের তিন পাশে রাস্তা রয়েছে। দক্ষিণের রাস্তায় গাড়ি চলে। উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে রিকশা, ভ্যান চলে। যখন গ্রামে পানি ওঠে, তখন রাস্তা থাকার কারণে লোকজনের চলাচলে কোনো সমস্যা হয় না। সব রাস্তায় রিকশা-ভ্যান চললেও গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ হেঁটে চলাচল করে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

প্রকৃতি যেন তার আপন খেয়ালে আমাদের গ্রামটি সাজিয়েছে। যেদিকেই তাকানো হোক না কেন, সেদিকেই সবুজ আর সবুজ। আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, বাতাবি, বেল, কুল, পেয়ারা, কদম, শিরিশ কড়ই, চাম্বল, মেহগনি, শিশুকাঠসহ নানারকমের গাছ গ্রামকে ছায়াময় করে তুলেছে। মাঠভরা শস্যখেতের উপর দিয়ে যখন বাতাস বয়, মনে হয় যেন সবুজ সমুদ্রে ঢেউ উঠেছে।

সামাজিক অবস্থা

অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের গ্রাম সচ্ছল। গ্রামের সবাই স্বনির্ভর বলে চুরি-ডাকাতি খুন-খারাবির কোনো বালাই নেই। গ্রামের শতভাগ লোকের অক্ষরজ্ঞান থাকায় কোনো রকমের কুসংস্কারও নেই।

উপসংহার

সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের গ্রাম। এমন গ্রামে জন্ম নিয়ে ধন্য আমি। আমাদের গ্রামের সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আমি এগিয়ে যাব। কুপ্রভাব থেকে গ্রামকে মুক্ত রাখব। আমরা সবাই মিলে গ্রামের ঐতিহ্য বজায় রাখব– এ আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

৬.৮ আমার পড়া একটি বইয়ের গল্প

আমি বই পড়তে খুবই ভালোবাসি। স্কুলের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি আমি অনেক বই পড়ে থাকি। আমার আব্বা-আম্মা আমাকে প্রায়ই নতুন নতুন বই উপহার দেন। একদিন আব্বা আমার জন্য একটি বই নিয়ে আসেন। বইটির নাম দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। বইয়ের নাম 'আম আঁটির ভেঁপু'। গল্পের বইয়ের নাম

এমন হতে পারে, আমি কখনোই ভাবিনি। আমি আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আব্বা, আম আঁটির ভেঁপু কী?' আব্বা বললেন, 'আমের আঁটি থেকে একরকম বাঁশি বানানো যায়, তাকে ভেঁপু বলে।' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আম আঁটির ভেঁপুর সঙ্গে গল্পটির সম্পর্ক কী?' তিনি বললেন, 'পড়ে দেখো, বুঝতে পারবে।'

আমি বইটি হাতে নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে দেখতে লাগলাম। বইটির লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচ্ছদে একটি মেয়ে একটি ছেলের হাত ধরে খোলা মাঠ ধরে দৌড়ে যাচ্ছে। বাতাসে মেয়েটির চুল উড়ছে। ছেলেটির হাতে একটি বাঁশি। আমি বইটি পড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ি। সামনে গ্রীষ্মের ছুটি, তাই পড়ালেখার তেমন চাপ ছিল না। আমি বইটি নিয়ে পড়তে বসি।

'আম আঁটির ভেঁপু' এক কিশোরী ও তার ছোট ভাইয়ের গল্প। মেয়েটির নাম দুর্গা ও ছেলেটির নাম অপু। তারা নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের প্রান্তে ভাঙা বাড়িতে বাস করে। তাদের বাবা হরিহর মানুষের বাড়িতে পূজা করে যা আয় করে, তা-ই দিয়ে সংসার চালায়। মা সর্বজয়া। তাদের সাথে আরও থাকেন এক বৃদ্ধ পিসি। এই নিয়ে তাদের সংসার। বাবার আয়ে তাদের সংসার ভালোভাবে চলে না, অভাব অনটন লেগেই থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে ভালোবাসার কোনো কমতি নেই। 'আম আঁটির ভেঁপু' একটি দরিদ্র কিন্তু ভালোবাসাময় পরিবারের কাহিনি।

আমার প্রিয় বইয়ের প্রচ্ছদ

দুর্গা খুবই খেতে ভালোবাসত। কিন্তু চাহিদামতো খাবার দিতে পারত না তার মা-বাবা। তাই সে নানা জায়গা থেকে খাবার নিয়ে খেত।
খাবারের প্রতি আকর্ষণের জন্য দুর্গাকে প্রায়ই মায়ের হাতে উত্তম-মধ্যম খেতে হতো। দুর্গা ছিল খুবই ডানপিটে মেয়ে, তাই মায়ের পিটুনি তার গায়েই লাগত না। সে টোটো করে বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু অপু ছিল লাজুক প্রকৃতির, দুর্গা ছাড়া তার আর কোনো বন্ধু ছিল না। দুর্গা তাকে মারলেও সে দুর্গার পিছে পিছে ঘুরত। দুর্গা অপুকে নানা জায়গা থেকে ফলমূল এনে দিত। এতে অপু খুশি হতো।

একদিন দুর্গাদের গরু হারিয়ে গেলে, অপু আর দুর্গা সেটা খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। গ্রাম ছেড়ে মাঠ পেরিয়ে তারা চলে যায় রেললাইনের উপরে। এ যেন একটা নতুন দেশ আবিষ্কার। তারা বিদ্যুতের থামে কান পেতে শব্দ শোনে। যখন দূর থেকে তারা ট্রেন আসতে দেখে, তখন দৌড়ে গিয়ে ট্রেনের পাশে দাঁড়ায়। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে ট্রেনের দিকে।
অপুদের এক প্রতিবেশী ধনী। তাদের বাড়ির এক মেয়ের বিয়েতে অপু ও দুর্গা যায় নিমন্ত্রণ খেতে। সেখানে একটি পুঁতির মালা হারিয়ে গেলে সবাই দুর্গাকে দোষারোপ করে এবং তাদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। গল্পের

এখানটাতেও আমার মনে হলো যেন তাদের সাথে আমিও ছিলাম। আমাকে যেন বিয়েবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার দুচোখ গড়িয়ে পানি পড়তে লাগল। এমন সময় মা আমাকে দেখে আদর করে জড়িয়ে ধরল। আমি খুবই লজ্জা পেলাম।

অপুর মধ্যে যেন আমি আমাকেই খুঁজে পাই। অপু লাজুক প্রকৃতির হওয়ায় তার কোনো বন্ধু নেই। সে একা একাই বাড়ির পাশের বাগানে ঘুরে বেড়ায়। হাতে লাঠি নিয়ে যোদ্ধা সেজে সে গাছপালার সাথে যুদ্ধ করে। দুর্গা অপুকে মাকাল ফল এনে দিলে অপু যেন সাতরাজার ধন হাতে পায়। কখনো মনে হয়, অপুর সঙ্গে আমিও বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াই। অপু তার বাবার সঙ্গে সন্ধ্যার সময় পড়তে বসে। এ সময় দূর থেকে ভেসে-আসা ট্রেনের শব্দে উদাস হয়ে যায় সে।

বইটি পড়তে পড়তে আমি যেন কোথায় হারিয়ে যাই। অপুর বাবা নতুন কাজের সন্ধানে শহরে যায়। এমন সময়েই ঘটে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা। দুর্গা ও অপু একদিন বৃষ্টিতে ভেজে। তারপর দুর্গার জ্বর হয় এবং সেই জ্বরে দুর্গা মারা যায়। এতে অপু প্রচণ্ড আঘাত পায়। দুর্গা ছাড়া অপুর পৃথিবী একেবারে ফাঁকা।

অপুর বাবা ফিরে এসে ওদেরকে নিয়ে কাশী চলে যায়। একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য অপুকে ছেড়ে যেতে হয় অতি চেনা, অতি আপন এই ভাঙা বাড়িটি। জিনিসপত্র গোছানোর সময় অপু একটি কৌটায় পুঁতির মালাটি খুঁজে পায়। সে বুঝতে পারে যে, দুর্গাই মালাটি চুরি করে এনে এখানে লুকিয়ে রেখেছিল। অপু মালাটি ফেলে দেয়, যাতে কেউ এটা দেখতে না পায়। এভাবে অপু যেন দুর্গার দোষ পৃথিবীর কাছ থেকে আড়াল করে।

আমি আমার অল্প বয়সে অনেক বই পড়েছি। কিন্তু 'আম আঁটির ভেঁপু' আমার হৃদয়কে যতখানি স্পর্শ করেছে, ততখানি অন্য কোনো বই পারেনি। সারা জীবন এই বইটির কথা আমার মনে থাকবে। আমার প্রিয় বইগুলোর মধ্যে সবার উপরে থাকবে 'আম আঁটির ভেঁপু'।

৬.৯ জাতীয় ফুল শাপলা

সূচনা

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ফুলের অবদান অপরিসীম। অন্যান্য ফুলের মতো শাপলাও সে-সৌন্দর্যের অংশীদার। শাপলা বাংলাদেশের সব অঞ্চলে সহজে পাওয়া যায়। শাপলা ফুলের সৌন্দর্য বাংলাদেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবেচনায় এবং খুব সহজেই পাওয়া যায় বলে শাপলা জাতীয় ফুলের মর্যাদা পেয়েছে। আমাদের জাতীয় ফুল শাপলার মতো অন্যান্য দেশেও জাতীয় ফুল রয়েছে। যেমন– ভারতের জাতীয় ফুল পদ্ম, ইরানের জাতীয় ফুল গোলাপ ইত্যাদি।

প্রাপ্তিস্থান

শাপলা জলে জন্মে বলেই এটি জলজ ফুল। খালে-বিলে, হাওড়ে-বাঁওড়ে, ঝিলে, পুকুরে, নদীতে, পরিত্যক্ত জলাশয়ে এ-ফুল জন্মে। এ-ফুল চাষাবাদ করতে হয় না। বিনা যত্নেই ফুটে থাকে।

জাতীয় জীবনে ব্যবহার

জাতীয় জীবনে এর অনেক ব্যবহারিক দিক রয়েছে। ডাকটিকিট ও মুদ্রায় শাপলার ছাপচিত্রের

ব্যবহার আছে। জাতীয় প্রতীকের মর্যাদাও পেয়েছে এ ফুল।

প্রকারভেদ

রঙের বিবেচনায় শাপলার রয়েছে রকমফের। শাপলা সাদা, লাল, নীল, হলুদ, কালচে লাল, বেগুনি-লাল, রক্ত-বেগুনি, নীল-বেগুনি প্রভৃতি রঙের হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সাদা, লাল ও নীল– এই তিন রঙের শাপলা পাওয়া যায়। অন্যান্য রঙের শাপলার তুলনায় সাদা শাপলা বেশি পাওয়া যায়। আমাদের জাতীয় ফুল সাদা শাপলা।

জাতীয় ফুল শাপলা

পরিচয়

পানির নিচের মাটি থেকে প্রথমে মূল বা শিকড় গজায়। আর সে-শিকড় থেকে সরু নলের মতো একটি দণ্ড পানি ভেদ করে উপরে উঠে আসে এবং পানির উপরে সে-দণ্ডটি থেকে পাতা বের হয়। পাতা বড় ও পুরু হয়ে পানির উপরে ভাসে। আর মূল থেকে একাধিক শাখা বের হয়, যা দেখতে অনেকটা ঝাড়ের মতো। একাধিক শাখাই মূলত শাপলার নল বা ডাঁটা। এসব নলের মাথায় কলার মোচার আকৃতির ফুলের কুঁড়ি ফোটে। ফুলগুলোও পাতার মতো পানির উপরে ভাসে। শাপলা ফোটে বর্ষাকালে। শাপলা ফুলের মেলায় প্রকৃতিকে অপরূপ সাজে সজ্জিত হতে দেখা যায়।

শাপলা পরিপূর্ণভাবে ফোটার সাথে সাথে পাপড়িগুলো ঝরে পড়ে; আর নলের আগায় গোলাকার বিচিটি পানিতে ডুবে যায়। পানি বাড়ার সাথে সাথে শাপলার বৃদ্ধি ঘটে। আর পানি কমার সাথে সাথে তা নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। শীত মৌসুমে খালে-বিলে, নদী-নালায় পানি না থাকার কারণে শাপলা মরে যায়। তবে বিচিগুলো সুপ্ত অবস্থায় থাকে। নতুন বর্ষার আগমনে শাপলাগুলোর শিকড় থেকে আবার চারা গজায়।

সৌন্দর্য

বর্ষার জলে শাপলা ফোটার সাথে সাথে প্রকৃতি ধরা দেয় নবরূপে। শাপলার সৌন্দর্য এমনভাবে ফুটে ওঠে যে প্রকৃতিকে অপরূপ বলে মনে হয়। জ্যোৎস্নারাতে নানা রঙের শাপলা রাতের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে।

উপকারিতা

শাপলা সৌন্দর্য বাড়ায়। শিশু-কিশোররা শাপলা ফুল হাতে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করে। তারা শাপলার নল দিয়ে মালা গাঁথে। এর নল বা ডাঁটা তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়। শাপলার বিচি থেকে খৈ হয়। তা ছাড়া শাপলা থেকে যে শালুক হয়, তা শুকিয়ে খাওয়া যায়।

উপসংহার

বাংলাদেশের অধিকাংশই জলজ অঞ্চল। বর্ষাকালে তার সম্পূর্ণ রূপ আমরা দেখতে পাই। এ সময় শাপলা জলজ ফুল হিসেবে প্রকৃতির শোভাবর্ধন করে। এর স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাঙালির লোকজীবনে, জাতীয় জীবনে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শাপলা ফুলের তুলনা হয় না।

৬.১০ জাতীয় ফল কাঁঠাল

সূচনা

দৃষ্টিকাড়া ফুল আর অজস্র উপাদেয় ফলে বাংলার প্রকৃতি ভরপুর। প্রকৃতির অসংখ্য ফল ভোজনরসিক বাঙালিকে তুষ্ট করে। এসব ফলের বিচিত্র নাম, ভিন্ন রূপ, নানা স্বাদ ও গন্ধ। গ্রীষ্মের ফল কাঁঠাল। এ-ফল গন্ধ, স্বাদ ও আকৃতিতে বাঙালির অতিপ্রিয়। কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল।

জাতীয় ফল কাঁঠাল

আকার-আকৃতি

জঙ্গল থেকে বাইর অইল এক ব্যাটা
গায়ে তার একশো একটা কাঁটা ॥

প্রচলিত এই ধাঁধাটির অর্থ হলো কাঁঠাল। গায়ে কাঁটার আবরণ নিয়ে কাঁঠাল ফলরাজ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যই ঘোষণা করে। আকৃতিতে এটি অনেক বড়। এক কেজি থেকে বিশ কেজি পর্যন্ত হতে পারে একটি কাঁঠালের ওজন। কাঁচা কাঁঠাল সবুজ বা সবুজাভ হলুদ কিংবা হলদেটে রঙের হয়ে থাকে। কাঁঠাল গাছ এবং ফল দুটোতেই থাকে সাদা দুধের মতো কষ। কাঁঠাল গাছ মাঝারি থেকে বড় হয়ে থাকে। একটি গাছে ধরে অনেক অনেক কাঁঠাল। গাছের গোড়া থেকে শাখা পর্যন্ত কাঁঠাল ফলে।

প্রাপ্তিস্থান

কাঁঠাল বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র পাওয়া গেলেও গাজীপুর, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, ময়মনসিংহ এবং যশোর অঞ্চলে এর ফলন বেশি হয়। মূলত লৌহ-সমৃদ্ধ লাল মাটিতে কাঁঠাল ভালো জন্মে। পাহাড়ি কাঁঠালের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও বান্দরবানের পাহাড়ে বিশেষ আকারের কাঁঠাল জন্মে। স্বাদেও এ-এলাকার কাঁঠাল সমতলভূমির কাঁঠাল থেকে পৃথক। দেশের চাহিদা মিটিয়ে কাঁঠাল আজকাল বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

ব্যবহার্য অংশ

কাঁঠাল অসংখ্য কোষসমৃদ্ধ হয়ে থাকে। কাঁচা অবস্থায় তা কেটে রান্না করে খাওয়া হয়। কাঁঠালের সব অংশই ব্যবহার করা যায়। কাঁঠালের কোষ এবং বিচি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাবার। এর ছাল গবাদিপশুর খাবার। কাঁঠালের বিচি ভেজে কিংবা রান্না করে খাওয়া যায়।

পাকা কাঁঠালের গন্ধ ও স্বাদ অতুলনীয়। কবির ভাষায় :

২০২৫

কাঁঠাল কণ্টকে ঘেরা ভিতরেতে কোষ,
তার তরে এ ফল কেবা দেয় দোষ।

কাঁঠাল পাকার পর এর মৌ মৌ গন্ধে চারপাশ মুখরিত হয়ে ওঠে। গাছের চারদিক পাখি বা কীট ছুটে আসে এর আস্বাদ নিতে।

চাষপদ্ধতি

কাঁঠাল উঁচু জমির ফল। যেখানে বৃষ্টির পানি জমে না, সেখানে কাঁঠাল গাছ ভালো জন্মে। বীজ এবং কলমের মাধ্যমে কাঁঠাল গাছের বংশবৃদ্ধি ঘটানো যায়। বীজ থেকে চারা উৎপন্ন করলে এবং সেই চারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে রোপণ করলে উৎপাদন ভালো হয়।

উপসংহার

কাঁঠাল বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশের উঁচু এলাকায় সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কাঁঠালের উৎপাদন বাড়ানোর প্রতি আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। তা ছাড়া কাঁঠালের জুস বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করে বাজারজাত করা যেতে পারে। এ-বিষয়ে আমাদের জাতীয়ভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

৬.১১ জাতীয় বৃক্ষ আমগাছ

ভূমিকা

আম বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ফল। বাংলাদেশের সব জায়গাতেই আমগাছ দেখতে পাওয়া যায়। আমগাছ আমাদের শুধু ফল দেয় না, এর প্রতিটি অংশ আমাদের কাজে লাগে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে আমগাছ বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আমগাছকে বাংলাদেশের জাতীয় গাছের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

আমগাছ

পরিচয়

আমগাছ চিরসবুজ বৃক্ষের অন্তর্গত একটি গাছ। এ-গাছ খুব বড় হয়। এর শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত এবং পাতা খুব ঘন। শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়ে আমগাছ ছাতার আকার ধারণ করে। এ-গাছের ছায়ায় বসলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আমগাছ প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত উঁচু ও ৩০ মিটার প্রশস্ত হতে পারে। আমগাছ দীর্ঘায়ু হয়। একটি আমগাছ একশো বছরের বেশি বেঁচে থাকতে পারে। সাধারণত

গাছ লাগানোর চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ফল দেওয়া শুরু করে। আমগাছের খুব বেশি যত্নের দরকার হয় না। যেকোনো জায়গাতেই এটি জন্মাতে পারে।

আমগাছের চাষ

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে আমগাছের চাষ হচ্ছে। গ্রামেগঞ্জে এমন কোনো বাড়ি পাওয়া যাবে না, যেখানে অন্তত একটি আমগাছ নেই। সাধারণত আমের আঁটি থেকে আমগাছ জন্ম নেয়। তবে এ-গাছ থেকে ফল পেতে চার-পাঁচ বছর সময় লেগে যায়। গাছও অনেক বড় হয়। বর্তমানে আমগাছের ডাল থেকে কলম তৈরি করে চাষ হচ্ছে। এ-গাছ আকারে ছোট হয় এবং ফলন হয় তাড়াতাড়ি। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে কলম আমগাছের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে অনেক ধরনের আমগাছ রয়েছে। একেক জাতের আমগাছের আকার-আকৃতি একেক রকম। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ফজলি, ল্যাঙড়া, আম্রপালি, খিরশা, গোপালভোগ, কিশানভোগ ইত্যাদি। ফজলি আমের গাছ খুব বড় হয়, অনেকটা বটগাছের মতো ঝুপড়ি হয়ে থাকে। আমগাছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মুকুল আসে। তখন চারপাশ মুকুলের গন্ধে ভরপুর হয়ে যায়। বৈশাখ মাসের শুরুতে মুকুল থেকে আম হতে শুরু করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকে। এক জাতের আম পাকতে পাকতে আষাঢ় মাস চলে আসে। একে আষাঢ়ি আম বলে।

উপকারিতা

আমগাছ শুধু আমাদের ফলই দেয় না, এর কাঠ, পাতা, মূল—সবই আমাদের কাজে লাগে। আমগাছের পাতা গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমগাছের কাঠ দিয়ে ঘরের থাম, দরজা, জানালা, আসবাবপত্র, নৌকা তৈরি হয়। এর সরু ডালপালা ও পাতা শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আম-গাছের ছায়া খুবই শীতল হয়। আমগাছ আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আম গবেষণা কেন্দ্র

বাংলাদেশের রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে আমের ফলন সবচেয়ে ভালো হয়। রাজশাহীতে একটি আম গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। সেখানে উন্নতমানের আমগাছের চারা উৎপাদন ও তার পরিচর্যা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটির গুণাগুণ ও পরিবেশ অনুযায়ী কোন গাছ কোন অঞ্চলে চাষের উপযোগী, তারও গবেষণা চলছে। আমকে কীভাবে আরও উপাদেয় ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন করা যায়, তা নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা করা হচ্ছে। সব ঋতুতে আমের ফলন হবে, এমন গাছ উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে। ছোট আকৃতির আমগাছ উদ্ভাবনের ফলে এখন শহর বা গ্রামের আঙিনাতেও আমগাছের চাষ করা যাচ্ছে।

উপসংহার

আমগাছ বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় একটি গাছ। দেশের মানুষের খাদ্যচাহিদা মেটানো, প্রয়োজনীয় কাঠের যোগান ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের উচিত আরও বেশি বেশি আমগাছ লাগানো ও এর পরিচর্যা করা।

৬.১২ বাংলাদেশের জাতীয় পশু বাঘ

ভূমিকা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের একটি জাতীয় পশু রয়েছে। এ-পশু হলো বাঘ। একে বলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ বন সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দরবনের অবস্থান বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল খুলনা-সাতক্ষীরা-বাগেরহাট জেলায়।

জাতীয় পশু বাঘ

আকৃতি

বাঘ বিড়াল প্রজাতির প্রাণী। বাঘ আকারে ও শক্তিতে অনেক বড়। বাঘের গায়ের রং হলুদ। হলুদের মধ্যে কালো কালো ডোরাকাটা দাগ থাকে। বাঘ সাধারণত বারো ফুট লম্বা এবং চার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। এদের দাঁত খুবই তীক্ষ্ণ ও ধারালো হয়। পায়ের থাবায় তীক্ষ্ণ ও ধারালো নখ লুকানো থাকে। বিড়ালের মতো প্রয়োজনে এরা সেই নখ বের করে আক্রমণ করতে পারে। এদের পায়ের তলায় নরম মাংসপিণ্ড আছে। যার ফলে তারা নীরবে চলাফেরা করতে পারে এবং সহজে শিকার ধরতে পারে। এদের গায়ের চামড়া খুবই শক্ত এবং ঘন লোমে ঢাকা। বাঘের পেছনের পায়ে জোর খুব বেশি। লাফ দিয়ে এরা অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। বাঘের মাথা গোলাকার ও বেশ বড়। এদের চোখ দুটি উজ্জ্বল এবং রাতের বেলা জ্বলজ্বল করে জ্বলে। বাঘ অন্ধকারে দেখতে পায়।

স্বভাব

বাঘ অত্যন্ত হিংস্র প্রাণী। এরা বনে থাকে। এরা খুবই শক্তিশালী ও ভয়ংকর হয়। অনেক বড় বড় প্রাণীকে এরা সহজে শিকার করে। বাঘের শক্তি ও রাজকীয় ভাবভঙ্গি দেখে একে বনের রাজা বলা হয়। বাঘ খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। এরা সাঁতারও কাটতে পারে খুব ভালো। সুন্দরবনের বাঘের সুনাম সারা পৃথিবী জুড়ে। এ-বাঘের সঙ্গে বাংলাদেশের নাম জুড়ে রাখা হয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বাঘ সাধারণত হরিণ, শূকর, গরু, ছাগল শিকার করে থাকে। শিকার না পেলে এরা অনেক সময় মানুষ শিকার করে। একটা বাঘিনী সাধারণত বছরে দুই থেকে পাঁচটা বাচ্চা দেয়। বাচ্চাদের প্রতি বাঘের মায়া খুব কম। ক্ষুধা পেলে এরা বাচ্চাদেরও খেয়ে ফেলতে পারে। তাই বাঘিনী বাচ্চা বড় না হওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে রাখে।

উপসংহার

বাঘকে হিংস্র পশু মনে হলেও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাঘের প্রয়োজনে রয়েছে। বাঘ তৃণভোজী প্রাণী খেয়ে এদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে। কেননা, তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তারা বনের গাছপালা খেয়ে উজাড় করে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের গৌরব। এদেরকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

৬.১৩ জাতীয় পাখি দোয়েল

ভূমিকা

"... কোকিল ডাকে কুহু কুহু
দোয়েল ডাকে মুহু মুহু
নদী যেথায় ছুটে চলে
আপন ঠিকানায়
একবার যেতে দে-না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়।"

জাতীয় পাখি দোয়েল

বাংলাদেশ অসংখ্য রূপ-রং-কণ্ঠের পাখির সমারোহে সমৃদ্ধ। যে-পাখির গান আর ডালে ডালে নেচে বেড়ানো দেখে মনে চঞ্চলতা জাগে, তার নাম দোয়েল। বাংলার অতি পরিচিত এক পাখি। দোয়েল বাংলাদেশে গানের পাখি হিসেবেও স্বীকৃত।

আকৃতি

আকৃতির দিক থেকে দোয়েল ছোট পাখি। এরা সাধারণত ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা হয়। স্ত্রী ও পুরুষ দোয়েল রং, আকার ও চেহারায় পৃথক হয়। পুরুষ দোয়েলের মাথা, ঘাড়, গলা, বুক ও পিঠের পালক চকচকে নীলাভ কালো। নিচের বাকি অংশের পালক সাদা। এদের ডানা কালচে বাদামি রঙের, তার মাঝে পিঠঘেঁষে সাদা ছোপ আর আর টানা দাগ। লেজ লম্বা, সরু থেকে মোটা। লেজে মাঝের দুটো পালক কালো, বাকি অংশ সাদা, এদের চোখ ও ঠোঁট কালো এবং পা গাঢ় সিসা রঙের। স্ত্রী দোয়েলের রং অনেকটা বাদামি ও ধূসর, দেখতে ময়লা বালির মতো। দোয়েল সবসময় তার লেজ উঁচু করে রাখে।

খাদ্য ও বাসস্থান

পোকামাকড় দোয়েলের প্রধান খাদ্য। আকারে ছোট বলে এদের তেমন বেশি খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। দোয়েল শস্যকণাও খেয়ে থাকে। এদের শিমুল ও মাদার ফুলের মধু খেতেও দেখা যায়। দোয়েল ঝোপঝাড়ে একাকী বা জোড়াসহ বাসা বেঁধে বাস করে। মানুষের বসতের কাছাকাছি দেয়াল কিংবা গাছের গুঁড়িতেও এরা বাসা বাঁধে। দোয়েল গাছের ডালে বাসা বাঁধতে পারে না। এরা খড়-কুটো বা শুকনো ঘাস জমা করে বাসা তৈরি করে।

প্রকৃতি

দোয়েল চঞ্চল এবং অস্থির প্রকৃতির পাখি। নাচের ঢঙে এরা লাফিয়ে চলে। মাটি থেকে দশ ফুট উচ্চতার ভেতরে এরা অল্প দূরত্বে উড়ে চলে। এদের দীর্ঘক্ষণ শূন্যে ভাসতে দেখা যায় না।

বিশেষত্ব

দোয়েলের বিশেষত্ব এর মোহনীয় সুরে ও সংগীতে। আকর্ষণীয় এই আদুরে পাখিটি সুন্দর সুরে গান করে এবং

আস্তে আস্তে শিস দেয়। বসন্তকালে এদের নাচ ও গানে মন ভরে ওঠে। এক্ষেত্রে কোকিল সবচেয়ে, পরিচিত সেটি তবে অতিথি গানের পাখি। আর এরা আমাদের একান্তই প্রকৃতির গানের পাখি। সারাদিন এমনকি সন্ধ্যার পরও দোয়েল গান গায়।

কেন জাতীয় পাখি

বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে দোয়েলের রূপ, রং, স্বভাব, গান মিশে আছে। দোয়েল তার সহজাত চঞ্চলতায় গাছের ডালে বসে যখন গান করে ও শিস দেয়, তখন বাঙালি বাংলার অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। বাংলার সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বলেই দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি।

উপসংহার

বাংলাদেশের সর্বত্র দোয়েল পাখি দেখা যায়। প্রকৃতির প্রতিকূলতা, তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে জীববৈচিত্র্যে যে ক্ষতি হচ্ছে, তাতে এ-পাখিও রেহাই পাচ্ছে না। দোয়েল তথা সব পাখির জন্য, বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত করাই আমাদের দায়িত্ব।

অনুশীলনী

১। প্রবন্ধ লেখ :

ক) **শীতের সকাল**। [**সংকেত** : ভূমিকা, শীতের সকাল, রূপবদল, শহরে শীতের সকাল, গ্রামে শীতের সকাল, শীতের সকালে খাওয়াদাওয়া, উপসংহার।]

খ) **বাংলাদেশের নদনদী** [**সংকেত** : ভূমিকা, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদী, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, উপকারিতা, অপকারিতা, নদীভাঙন, উপসংহার।]

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল ষষ্ঠ–বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

পরিশ্রম উন্নতির চাবিকাঠি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।